Neel Kuthi

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

নীল কুঠি

গার্গী ভট্টাচার্য

।।। কপাল কুন্ডলাকে ।।।

"God is a mean-spirited, pugnacious bully bent on revenge against His children for failing to live up to his impossible standards."
– **Walt Whitman**

❋❋❋

নীল কুঠি

নীল কুঠির মেয়ে, তনুজা। তপতী, তারা আর তনুজা -তিনবোন। ওদের বাবা ছিলো গোয়ালা।কলকাতার অল্প দূরে , অভয়গ্রামে ওদের বাস ছিলো। বিরাট গোশালা আর অনেক জমিজমার মালিক ছিলো ওদের বাবা , শিবেন ঘোষ। সেই মহলের নামই নীলকুঠি। ওদের মায়ের নাম ছিলো অসীমা। মা ছিলো সাক্ষাৎ মা দুগ্গা। কিন্তু মায়ের সাথে বাবা কথা বলতো না। ওরা কৈশোর থেকেই দেখছে। ওদের পাঁচটি ভাইও ছিলো।রামু, সোমু, মনু, লালু আর বুলু।

ওদের বাসাটি ছিলো সর্ব ধর্ম বর্ণ ইত্যাদির মিলন ক্ষেত্র। ওদের গ্রামখানি সীমান্তে হওয়ায় প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আসতো। তাদের অনেকেই ওদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। পরে জীবনের মূলস্রোতে মিশে গেছে। এমন কিছু মানুষের গল্প শুনেই বড়

হয়েছে তনুজা । পরবর্ত্তীকালে সে পরবাসে থিতু হয় । আস্তে আস্তে অনাবাসী ভারতীয় হয়ে ওঠে ।

আসলে তনুজার পূর্বপুরুষেরা , জাতিতে গোয়ালা হলেও ; ঐ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারের প্রদীপ ছিলো । তাই ওখানকার জমিদার বংশ, ওদেরকে- নিজেদের লেঠেল হিসেবে কাছে রাখতো । পরে ওর ঠাকুর্দার বাবাকে, একেবারে দেওয়ান মানে নায়েব করে নেওয়া হয় । তাই নীচু জাতি হলেও ওরা অনেকটাই উচ্চজাতের মতন হয়ে ওঠে । আচার, বিচার, ব্যবহারে । ওদের বাড়ির মেয়েরা সবাই, ওদের বাবা ও কাকাদের মতন নানান খেলা খেলতো । ওর বড়দি তপতী খেলতো ভলিবল । আর মেজদি ছিলো কবাডি ও খো খো তে ।

তনুজা কিন্তু ছোট থেকেই তীরন্দাজ হবার স্বপ্ন দেখতো । বাড়ির গুরুজনদের জানালে, তারাও এই খেলা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেয় । ফলে সে একসময় দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দেয় । পরে এই খেলাকে কেন্দ্র করেই ওর তৎকালীন কোচ, বরিস কোকোভিচের মন জয় করে এবং তার স্ত্রী হিসেবে যৌবন শুরু করে ।

কোকোভিচ ছিলো তনুজার চেয়ে চার বছরের ছোট । তবুও ওর মুক্ত মনের পরিবার তাকে ধিক্কার দেয়নি ও বরিসকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি

করেনি । বরিসের অবশ্য আগেও বান্ধবী ছিলো । সেই মেয়েটির একটি ছেলে ছিলো, যার বাবা বরিস । আবার বরিস যখন প্রথমবার বিয়ে করে, তখন ওর স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার একটি মেয়ে হয় । পরে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায় , তনুজার জন্য ।

তনুজার কোনো সন্তান হয়নি । কারণ সে চায়নি । খেলা নিয়েই জীবন কাটালো । তার কাছে তীর ধনুক ব্যাতীত আর কিছু দুনিয়ায় নেই যা থেকে সে মধু শুষে নিতে পারে । কাজেই মা না হলেও সে সুখী আর আগের পক্ষের দুই সন্তান যখন ওদের বাড়িতে আসতো তখন আর নিজেকে সন্তানহীনা মনে হত না ।

পরিচিত মহলে বলতো ::: **জীবনে কত কিছু করার আছে ! ওদের পালবার সময় কৈ আমার ? ওসব করতে গেলে আমি আর toxophilite-- হতে পারতাম না ।**

পুরাতন কালে মানুষ, তীরধনুক দিয়ে হয় শিকার করতো অথবা যুদ্ধ ! ইদানিং বন্দুকের রমরমা শুরু হওয়াতে লোকে সাধারণত: এগুলিকে খেলা হিসেবেই

দেখে । কখনও বা খেলার ছলে বন্য পশু মারার জন্য এই পন্থা নেওয়া হয় । হরিণ, শূকর , বুনো হাঁস

ইত্যাদি মারা অথবা নিছকই আনন্দের জন্য পাখি মারা । তবে এরা কেবল ব্যাধ নয়, খেলোয়াড়ও বটে ।

তাই বিদেশে পৌঁছে তনুজা, এমন তীরের নিশানা খুঁজে নিলো যে তীরন্দাজ জীবনে সে অনেক এগিয়ে গেলো । মেডেল পায় , সুনামও কুড়ায় । সবচেয়ে বড় কথা তার মনোবাসনা পূর্ণ হয় ।

আধুনিক তীরের ফলা ও ধনুকের ছিলা ; অর্জুনের তীরের চাইতে একেবারেই ভিন্ন । অনেকই মর্ডান । তবুও তাতে মজা কিছু কম নেই ।

তনুজা অবশ্য অর্জুনের ভক্ত নয় । সে কর্ণ, একলব্য ও মেঘনাদ্‌কে গুরু মানতো ।

আর ওর হাতের কাজও ছিলো অনবদ্য । নির্ভুল তার নিশানা আর তীরের গতিপ্রকৃতি ।

তনুজাকে দেখতেও একটু টমবয় গোছের । তাই হাতে তীর ও ধনুক ভালই মানাতো , হাতা খুন্তির বদলে ।

জীবনে, মনের মতন সবকিছু -সবার হয়না । গল্পেও না । কাজেই তনুজা একদিকে খুশী হলেও অন্যদিকে তার একটা ব্যাথা ছিলো । সেটা হল এই যে সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলো নিজের স্বার্থে । কিন্তু ওখানে লোকেরা কত দু:খে আছে । কত ছেলেমেয়েরা ওর

মতন তীরন্দাজ হতে চায় কিন্তু কোনো সুবিধেই নেই । কাজেই ওর মনে হত যে তাদের জন্য তো কিছুই করা হলনা !

বুকের ভেতরে, একটা চিন্‌চিনে ব্যাথা হত সবসময় ।

ওর স্বামী বরিস বলতো যে লোক দেখানো কিছু করার চেয়ে, সেই বিষয়কে ভালোবেসে কিছু করার দাম অনেক বেশি । তাই যেদিন মনে হবে যে এই কাজটার জন্য সবকিছু ছাড়তে পারবে সেদিন কাজ শুরু করো । তখন যেন পিছু হটতে না হয় ।

তাই দেশের নানান সংস্থায় কিছু অর্থ দান করেই খুশি ছিলো তনুজা । এছাড়া সে নানান ভিডিও দেখতো । টিভিতে এসব লোকের সম্পর্কে কিছু হলেই দেখতে বসতো। কিন্তু এইসব মানুষের জন্য দেশত্যাগ করার কোনো সংকল্প তার ছিলোনা । পরবাসই তার দেশ এখন তাই পরবাস ছেড়ে যেতে রাজি ছিলো না । এত সুবিধে ছেড়ে যাওয়া সোজা কথা নয় । অত করাপশান আর প্রাচীন সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে । তাই বরিসের সাবধান বাণী মনে করেই কেবল এদের দূর থেকে দেখতো ।

আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে সবই বদলায় । এসব দেখতে দেখতে একদিন সেইক্ষণ এসে হাজির হল যখন

সে সবকিছু ছেড়ে অসহায় মানুষের দরিয়ায় গা ভাসাতে সক্ষম ! আর তাকে কিছুতেই কোনো বস্তু বা প্ল্যান দিয়ে আটকানো যাবেনা , তাই একদিন সে স্থির করলো ;বাকি জীবনটা ওদেরকেই দেবে ।

কিন্তু প্লেনে চড়ার আগে সে দেখে নিলো কোথা থেকে শুরু করবে । এক বৃদ্ধ ইউ-টিউবে আসে । অনেক বয়স তার মনে হয় । থাকে ভারতের, ফুলগড়ে । বিভিন্ন রান্নাবান্না করে করে দরিদ্র শিশুদের দান করে । কতনা স্কুল ও কলেজে ; এর কল্যাণে লোকে ভালো মন্দ খেতে পারে ।

ম্যাগি, বিরিয়ানি, পাউরুটির পোলাউ, বড় বড় মাছের কালিয়া , ডিমের ডেভিল কী নেই ?

একা হাতে রেঁধে ; এই এত্তো বড় বড় কড়াই ইত্যাদিতে সেই মানুষটি, গরীবদের মধ্যে ওগুলো বিলিয়ে দিচ্ছে ।

আর সারা দুনিয়া থেকে মানুষ, দুই হাত উপুড় করে তাকে দান করছে । তনুজার মনে হল ; এমন এর কাজের বহর যে এতদিনে হয়ত দান থেকেই সে লাখপতি হয়ে উঠেছে । তবে তনুজার কাজ ওকে জাজ্ করা নয় ওর কাজে সাহায্য করা । তাই সে স্থির করে দেশে ফিরবে । গিয়ে, নিজের চোখে সব দেখবে । এই বৃদ্ধের সাথে কিছু যুবক থাকে । তারাই ভিডিও শুট্

করে করে কম্পিউটারে তোলে। টিভিতেও নাকি একে নিয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে। বিলম্বিত লয়- নাম দিয়ে।

তনুজা খুবই ইম্প্রেসড্ । এবার সামনা সামনি গিয়ে দেখবে , সাক্ষাতে মুগ্ধ হবে । লোকটি গ্রামীণ হলেও সাহেবী টোনে ইংলিশ বলে । ঠার্কি উইদ্ স্পাগেটি এনড্ কার্বোনারা সোজ্ । একদম শেফ্ Antonio Carluccio মতন !

আর এমনিও একজন ভালোমানুষের দেখা পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার । তাই খুবই উচ্চাশা নিয়ে তনুজা একদিন হাজির হয় সেখানে । যেখানে বড় বড় কড়াইতে করে মাংস, মাছ আর ডিম রান্না করা হয় হতভাগাদের জন্য । মধু বিতানের সুরেলা হিল্লোলে ।

ম্যাগি হয় দেশী ধাঁচে ! গরম তেলে পেঁয়াজ, জিরে , রসুন ও আদা ফোড়ন দিয়ে তাতে ক্যাপসিকাম, গাজর, বিন্স , আলু ও ফুলকফি দেওয়া হয় ও হলুদ আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে নাড়া হয় । একটু ফ্রাই হলেই ম্যাগির মশলাটা দিয়ে আবার নাড়া হয় । শেষে ম্যাগি ও জল দিয়ে, পর্ব শেষ হয় !

আলাদা করে ডিম ভেজে রাখা হয় । সেগুলি পরে মিলিয়ে দিয়ে তৈরি হয় অভিনব, রং-বাহারি হেঁশেলের ম্যাগি বা ভজকট্ ন্যুডুলস্ !

অনেক সময় কচুর লতি ও সর্ষে শাক দিতেও দেখা গেছে । তনুজা অবশ্য সেই বিচিত্র ম্যাগি খেয়ে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে । বরিস বলেছে যে বেশি আশা করো না, ওটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি হবে !

সব স্পাইস একসাথে মিলিয়ে দিলে, কেমন লাগবে না খেয়েও বোঝা যায় । না কোরিয়ান, না চাইনীজ্, না বাঙালী ! কোনোটাই হবেনা ।

তনুজা অবশ্য এতটা চিন্তিত নয়, এই খাদ্য নিয়ে । কারণ এখানে কাবাবের বদলে এই ম্যাগি নয় , ন্যুডুলস্ হিসেবেই ম্যাগি যাচ্ছে , কাজেই কাবাবও হয়ত যাবে ফিউশান আকারে ; কিন্তু কাবাবের পোশাকেই যাবে ।

এই সততাটাই তনুজাকে নিয়ে গেছে ; সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে ।

সম্প্রতি এই বৃদ্ধ নাকি ঘোষণা করেছে যে একটি বিরাট মহল, কিছু দরিদ্র মানুষকে মানে শিশুদের দান করবে । সেই মহলের নাম নীলকুঠি । তবে এটা তনুজার বাড়িটা নয় । অন্য কোনো নীলকুঠি, যার অবস্থান ঐ ফুলগড়ে । তার ছবিও দেখেছে দর্শক ! একটি

সুবিশাল বাড়ি , নীল রং , কাচের বড় বড় জানালা আর শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ও বারান্দা ।

নীলকর সাহেবদের পরিত্যক্ত কুঠি এটা । সরকার একে অসংখ্য বার মেরামৎ করে করে- হয়রান ! নানান ভৌতিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে একে ঘিরে তাই কেউ এখানে থাকেনা । হাত বদল হতে হতে এখন নিঃস্ব হয়েছে নীলকুঠি তাই হয়ত বিচক্ষণ মানুষ , অনেক জীবন দেখা বৃদ্ধ মানুষটি স্থির করেছে যে এই বাড়িটা দান করা হবে কিছু হতভাগাকে । কারণ সরকার আর এই ব্যাপারে মাথা গলায় না । একে কিঞ্চিৎ মেরামৎ করে নিলেই হবে। আর আধুনিক যুগে ভূত ফূত কেউ বিশ্বাস করেনা । তাই কেউ প্রতিবাদও করবে না ।ফুলগড়ের মানুষও এখন মোবাইলের দৌলতে হাতের মুঠোয় করেছে দুনিয়া । তাছাড়া সর্বহারার সংখ্যা নেহাৎই কম নয় অথচ এই এত্তো বড় একটা মহল এমনি এমনি পড়ে আছে । তাই একে রাইট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেই মঙ্গল । সবারই ! বাড়িটির ইতিহাস শুনে কোনো প্রমোটারও একে নেয়নি । কেউ যদি না কেনে তাহলে তো প্রমোটরের লস্ হবে ! যাদের রুচিহীন আর্কিটেক্ট বলে অভিহিত করা হয় ; সেইসব টাউন প্ল্যানিং করা কিংবা এঁদো-পচা মহল কিনে, তাকে রূপের আলোয় ডোবানে স্থপতিরাও এই বাড়ি নেয়নি । তাই এখনও পড়েই আছে !! তবে ভগ্ন দশা

নয় । প্রাচীন মহল মনে হলেও সরকারের সুনজরে বহুদিন থাকায় এখনও একটা বাহার আর জেল্লা আছে । আর অনেক আগের মহল বলেই হয়ত এখনও নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে । ভেজালের স্পর্শ লাগেনি বলে ।

নীলকুঠির স্পর্শ তনুজাকে জীবন্ত করে । নিজের ফেলে আসা দিনের কথা আরো মনে পড়ে যায় । নীলকুঠি যেন ওকে ডাকছে , দুই হাত তুলে !

এই বিশাল মহলের ছোঁয়ায়,সে যেন নিজের হারানো দিনকে ফিরে পাবে ! ওদের নিজেদের বাড়ি সেই নীলকুঠিও আর নেই তো ! প্রমোটার ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফ্ল্যাট করে ফেলেছে । যা বহু বাড়ির কপালেই জুটেছে !

ওদের পাঁচ ভাইয়ের কেউ আর বাংলায় নেই । আর কাকারাও সবাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে । তাই ঐ বাড়ি ; শেষ পর্যন্ত ভেঙেই ফেলা হয়েছে । গোয়াল নেই । গরু নেই । নেই ধানক্ষেত, মটরশুঁটি , টমেটো , বেগুন ক্ষেতগুলো । ওদের জলছবিও নেই !

আছে শুধু বিরাট বিরাট গাড়ির মেলা আর অট্টালিকার ছায়া ; ঐ চত্বরে । তার সঙ্গে পুরনো নীলকুঠিকে মেলানো যায়না !!!

অনেক মানুষ ওখানে বেড়ে উঠেছে । তাদের মধ্যে কিছু বিহারিও ছিলো ! ওরা শহরে ট্যাক্সি চালাতো । ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করতো । তারা, ওদের এই উপকারি মহলের নাম দেয়- নীলাকোঠি !!!

অনেক বিহারি মানুষ, ওদের নীলাকোঠিকে দেখতে আসতো ! চোখের দেখা দেখতে । যেমন জগদীশ্ এসেছিলো । এখানে, সে কলেজে পড়তে আসে । আগেই নীলাকোঠির কথা শুনে একদিন দেখতে আসে । কোন সে বাড়ি , যা অপরিচিতদেরও ঠাঁই দেয় ?

ওদের গুদামে স্টক করা কফি , চা আর অজস্র গ্যাসের সিলিন্ডার দেখে লোকে হাঁ হয়ে যেতো । অচেনা কারোর জন্য এত আয়োজন । তাই হয়ত ।

পরে সে বড় ইঞ্জিনীয়ার হয় । তখনও মিষ্টি নিয়ে আসে সবাইকে খাওয়াবে বলে ! আজ আরেক নীলকুঠিকে চাক্ষুষ করতে চলেছে তনুজা, অন্য বিহার থেকে- সেই একই বাংলায় !! আনন্দ হচ্ছে আর উত্তেজনা । উহ্ ! দারুণ লাগছে । নীলকুঠির কথা ভেবে , নিজের বাসা আর এই ভিন্নস্বাদের বাসার কথা ভেবেও ।

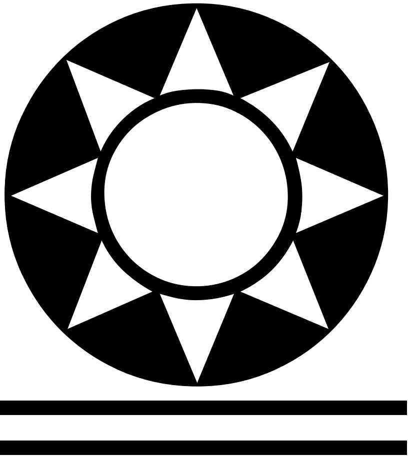

তনুজার নিজ নিকেতন নীলকুঠির কথা মনে পড়ে । নস্টালজিয়া আর কি ! কতনা মানুষের দল সেখানে থেকেছে , খেয়েছে । জীবন শুরু করেছে নতুন করে ।

তাদের নতুন জীবন গড়ার সুযোগ দিয়েছে ; গোয়ালা পরিবার । বিরাট গরুর গোয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে- গোলাপ ক্ষেত । তনুজার বাবার নিজ হাতে গড়া । তৈরি করা ---! **গোশালার পরেই কৃষ্ণের উপবন । এরকমই বলতো বাবা ।**

লোকে দেখতো ; একদিকে গোবরের মাখামাখি আর অন্যদিকে অপূর্ব ফুটন্ত সব গোলাপ । নানা আকারের আর রং এর । তার রূপে চোখ জুড়িয়ে যেতো ।

বাবা বলতো , আমরা শ্রীকৃষ্ণের বংশ । আমাদের সবকিছুতেই একটা বিশেষত্ব থাকবে ।

যন্ত্র দিয়ে, গোমাতার স্তন থেকে অমৃত ঝরানোর কায়দা ওর বাবাই ওদের ওখানে চালু করে । সেই মেশিন বাবার তৈরি । কোনো বিদেশী যন্ত্র নয় !

লোকে দেখতে আসতো ।

গোয়ালিনী সুলতার প্রেমে পড়ে, ওদের বাড়ির এক কত্তা । সুলতা ওদের খাটালে কাজ করতো । দেখতে ভালো হলেও, ওর নাকটা একদম চ্যাপ্টা ছিলো বলে লোকে ওকে নাক চেপ্টি বলে ডাকতো । সেই সুলতাকে ছাড়া সেই কত্তা নাকি বিয়েই করবে না !

বাড়ি ভর্তি লোকের মাঝে সে ঘোষণা করলো যে বিয়ে করতে হলে সুলতাকেই করবে ।

ওদের পরিবারের লোকের যত না আপত্তি ছিলো নাক চেপ্টি বলে, তার চেয়েও বেশি আপত্তি ছিলো সে নীচু জাত বলে । গোয়ালাদের চেয়েও নীচু জাত !

আজ হাসি পায় তনুজার । ব্রাহ্মণত্ব তো নেই আছে গোয়ালাত্ব । তারও চেয়ে নীচু আর উঁচু নিয়ে লড়াই । মানুষ সত্যিই- কিছু একটা নীতি আর লজিক খুঁজেই নেয় ।

পরে আর সেই কত্তা, শাদি করেনি । কিন্তু সে নিয়মিত **নাক চেপ্টি সঙ্গ** করতো । তাদের ছেলেও হয় । নাম তার গোবর্ধন । সবাই সব জানতো, তবুও নাক চেপ্টিকে বাড়ির বধূ বলে কেউ স্বীকার করেনি ।

পরিবারের আরেক মেয়ে , বেবী । বেবীর তো বিয়েই হলনা ! দু- দুবার তার বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙে যায় । যে-ই আসে ; সে-ই পিঁড়ি থেকে উঠে যায় বেবীর ঘনত্ব দেখে । স্থুলতা । যা কিনা ফটোতে বোঝা যেতোনা কারণ ফটো তোলা হত ওকে ইটের ওপরে দাঁড় করিয়ে আর তারপর রং এর ছোঁয়া দিয়ে ওকে রোগা করা হত ! ফটো ফিনিশের দক্ষতায়। তবে বেবী কিন্তু পুতুল নাচ শিখে নিয়েছিলো, লোকাল এক ব্যাক্তির কাছে । পরবর্ত্তী জীবন- সে এই নাচ দেখিয়ে কাটাতো । পুতুল কথা বলতো ।

বেবীর দুখী দুখী মুখটাতে, উজ্জ্বল আলোর আভা আসে এই কাজ করতে পেরে । লোকে কত প্রশংসা করতো । ওদের বাড়ি থেকে কেউ ওকে বাধা দেয়নি । কাজেই সে অনেক এগিয়ে যায় । সম্পর্কে তনুজার পিসি হতো সে ।

হারান কাকা দেখাতো বায়াস্কোপ । একটা বড় বাক্স নিয়ে নিয়ে ঘুরতো, পাড়ায় পাড়ায় । তার মধ্যে সিনেমা ভরা থাকতো । আসলে নানান ঠাকুরের ছবি । একের পর এক ডিসপ্লে হতো ঠাকুরের চিত্র । তখনকার দিন হল টিভির আগের যুগ । কাজেই ওসব সিনেমা দেখেই ছেলেপুলেরা মুগ্ধ হত । হারান কাকার বাড়ি ছিলো দক্ষিণে , সাগরপাড়ে ।মাসে একবার করে বাড়ি যেতো । ট্রেন থেকে নেমে নৌকো আর তারপর তিনঘন্টা হেঁটে --- ওর বাড়ি । ঐভাবেই যেতো সে ।

বাবা ওকে পথে পথে ঘুরতে দেখে, একদিন বাড়িতে এনে তোলে । মাকে বলে :: গিন্নী দেখো, তোমার আরেক ছেলেকে আনলাম ।

তখন বাবা ও মায়ের কথা হতো । পরে কথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় । আসলে বাবা, পরেও মাকে কোনোদিন অসম্মান করেনি । কেবল কথা বলতো না ।

লোকে বলতো ; ওর বাবা নাকি- ওদের মাকে অন্য পুরুষের বাহুবন্ধনে দেখে ফেলে । সেই থেকে কথা বন্ধ । ঝগড়াও করেনি । কিছু জানতে চায়ওনি । শুধু কথা বলতো না । মাও কিছু বলেনি ।

বাবা ; বন্ধুদের বলতো যে ও আমার সন্তানের মা । ওকে তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারিনা । ও যাই করুক না কেন । আর কেষ্টর তো গোপিনী থাকবেই ।

সেই ব্যাক্তি অর্থাৎ যার স্পর্শ ওর মাকে অপবিত্র করেছে, সেই লোকটির নামও গৌরহরি। ওদের বাসায় তার যাতায়াত ছিলো । লোকটি নাকি ওর মা, অসীমার গ্রামের লোক । পাতানো দাদা । এই বলেই ওদের বাড়িতে ঢোকে । পরে গরুর খাবার ; সাপ্লাই দিতো । ওদের গোয়ালের সব গরুকে, নানাবিধ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হতো । সেসব আনতো ঐ লোকটি । গৌরহরি । সেখান থেকেই, পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা ।

পরে অবশ্যি জানা যায় যে সে মায়ের পূর্ব জীবনের এক প্রেমিক । সীমার মাঝে ;অসীমার বয়ফ্রেন্ড এসে থাকতে শুরু করে ।

গরুকে এমন খাদ্য দিতে হয় যাতে তার দুধ ভালো হয় আর মাংসও সুখাদ্যের পর্যায় পড়ে । তনুজাদের বাড়ি

থেকে বৃদ্ধ গরু ইত্যাদিরা চলে যেতো মুসলিমদের কসাইখানায় । সেখানে ওদের কেটে ফেলতো ।

ওর বাবা এমনিতে মিনি ডেয়ারি শুরু করে । নাম -- **তারা মিল্ক ।** যেই দুধে তারার কুচি আছে । এমন সব বিজ্ঞাপন হতো । সেও তৈরি হতো ওদের বাড়িতেই । তারও লোক ছিলো । সেও এক বেকার শিল্পী ও লেখক । আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে কাজ না পাওয়া এক যুবক ও তার স্ত্রী । তারাই ওদের এই ডেয়ারির সব বিজ্ঞাপন লিখতো । আঁকতো । ওদের বাড়িতেই থাকতো । নাম অমল আর মণিমালা ।

ওরা, দাদা আর বৌদি বলতো । **সেই তারা দুধের সাপ্লাই ; ওদের লোকাল বাজার থেকে কলকাতা অবধি পৌঁছায় । বাবা আসলে আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ ছিলো । এর পুরো ক্রেডিট বাবা অমল/মণিমালাকেই দিতো । বলতো , ওরা এমন সুন্দর অ্যাড বানিয়েছে যে তারা মিল্কের দুধ স্বয়ং কামধেনু দুধে পরিণত হয়েছে ।**

অনেক ভালো জাতের গরুমোষের- বাছুর তৈরি হয়েছে, ওদের সিমেন ব্যবহার করে করে । সেগুলো কখনো কখনো বাবা কিনেও এনেছে, বাইরে থেকে । পর্যাপ্ত পরিমানে দুধ আর ফেনা ফেনা অমৃত তৈরি

করতে এইসব সিমেন জমিয়ে, নকল উপায়ে সৃষ্ট গরুর জুড়ি মেলা ভার ।

সবুজ সবুজ ঘাস নিয়ে হাজির হত মেয়েরা । আর উপযুক্ত খাবার নিয়ে গৌরহরি । নিজেদের বাড়িকে তনুজার গোয়াল বা আধুনিক খাটাল নয় মনে হতো এক আশ্রম । যেখানে মোহনবাঁশি হাতে নিয়ে সত্যি সত্যি কেষ্ট ঠাকুর নাচে । তার নাচের ভাষা বোঝে কেবল ওর বাবা, শিবেন ঘোষ । অসীমা যার কাছ ছাড়া হলেও- সীমার মাঝে অসীমকে সে বাঁধতে পেরেছিলো ।লোকে বলতো :: বাঙালরা এরকম জেনেরাস্ হয় । কেউ এলেই, তাকে না খাইয়ে ছাড়েনা । অচেনা মানুষকেও তাদের বাড়িতে ঠাঁই দেয় । কিন্তু তোমরা তো পশ্চিম বঙ্গীয় !

ওর বাবা , শিবেন ঘোষ শুধরে দিতো :: আমরা দক্ষিণ বঙ্গীয় । উত্তর বঙ্গীয়দের সংস্কৃতি ভিন্নধরণের । ওদিকে পাহাড় , চা বাগান আর ফলের ঝাড় । ওদের জীবনধারা অন্য ধরণের ।

তনুজাকে ওর অনেক বন্ধু বলতো --তোরা তোদের শিকড়কে চিনিস্ । আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, তারা কোনোদিন নিজেদের গ্রাম ও তার মাটির স্পর্শ পাইনি । এমনই হতভাগা আমরা ।

<u>সত্যি , তনুজার মনে হত যে ও খুবই ভাগ্যবতী । কারণ শুধু মাটি নয়, ওদের আছে এক গোটা আশ্রম । যেখানে মোহনবাঁশি বাজায় স্বয়ং কেষ্টঠাকুর ।</u>

ঠাকুরের কথায় মনে হল যে ওদের ওখানে ধুনুচি নাচ করতো এক মেয়ে । নাম তার সোহাগ । সোহাগ সরকার । বাড়িতে প্রতিবছর দুর্গাপুজো হতো । ঠাকুর গড়তো চন্ডীখুড়ো । আর ধুনুচি নাচতো সোহাগ ।

দূর্দান্ত সেই নাচ । এমনিও সোহাগ ভালো নাচতো । তার নাচ দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হত মাঠঘাট ।

এখন সে সিনেমা করে । ন্যাশেনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে । মেয়েটি ওদের বাড়িতে আশ্রিত ছিলো । বাংলাদেশ থেকে আসে । এখনও যোগাযোগ আছে তনুজার সাথে । ওর কাছেই প্রথম ইউ-টিউবের ভিডিও ইত্যাদির কথা শোনে তনুজা । সোহাগই বলে :: ইউ-টিউব দেখবি । নানান লোকের ডাইরেক্ট অভিজ্ঞতা , পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় । সাংবাদিকের কলমে পড়ে নয় । দারুণ সব ভিডিও থাকে । একেবারে টাট্কা আর ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতা সব । টিভি দেখিস্ না । ইদানিং টিভি দেখলে অবসাদ বাড়ে । মনে হয় জগতে

আর ভালো কিছু হবেনা । সংবাদ মানেই খুন , জখম , বোমাবাজি আর মুন্ডুচ্ছেদ । তার চেয়ে ভিডিও দেখ্ ।

সোহাগ এখনও সময় পেলে দেখা করে তনুজার সাথে । বলে :: আমাদের আশ্রমের মতন বাড়িটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো । আর দুগ্গা ঠাকুরের পুজো হয়না আর আমার ধুনুচি নাচও হয়না ।

তনুজা অবশ্য ওর বর আর বিদেশী বন্ধুদের জন্য প্রাইভেট ধুনুচি নাচের আয়োজন করে । যেখানে চুল পেকে যাওয়া সোহাগ কিছু সহযোগীকে ট্রেন করে নিয়ে নেচে দেখায় । বিদেশীরা খুব আনন্দ পায় ।আইডিয়াটা অবশ্যি সোহাগের । লোকে ধন্য ধন্য করে ।

আবার এক ঢাকি , সে ওদের বাড়িতে থাকতো তবে অল্প কিছু সময়ের জন্য । গ্রাম থেকে ওর বাবা তাকে পুজোতে ঢাক বাজানোর জন্য আনে ।

সেই ব্যাক্তি -যার নাম মোহনদাস দাস , সে মেয়েদের একটি ঢাকি দল তৈরি করে । মেয়েরা ভারী ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাতে অক্ষম, তাই ওদের জন্য হাল্কা ঢাকের সৃষ্টি করে । মেটালের ঢাক কিন্তু শব্দ হয় আসল ঢাকের মতনই । আর হাল্কা বলে মেয়েদের বহন করতে কষ্ট হয়না । সমস্ত কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে তাই মেয়েরাও, আজ ঢাক শিল্পে পারদর্শিতা দেখাচ্ছে

। মোহনদাসের আবিষ্কৃত, লাইট এই ঢাকের কল্যাণে ।এর নাম ; মেয়েলি ঢাক না দিয়ে দেওয়া হয়েছে টাক ।

এই নব যন্ত্রের পেটেন্ট করে দেয় ওদের বাড়ির এক যুবক , ওর খুড়তুতো ভাই কেতন । ওরা দুই ভাই । চেতন আর কেতন । ওদের জন্ম হয় বিহারে । তাই এমন নাম রেখেছে ওদের । পরে কাকা , ওদের আশ্রমে এসে থিতু হয় । চেতন আমেরিকায় যায় আর কেতন কলকাতায় কাজ করতো । পেটেন্ট ল-ইয়ার হিসেবে । সেই-ই ঐ ঢাকের পেটেন্ট করে দেয় , মোহনদাসের নামে । টাক ফ্রম মোহনদাস ।

মেয়েদের বাড়ির বাইরে এনে, তাদের ঢাকশিল্পী তৈরি করা কম কথা ছিলো না সেই যুগে । কাজেই মোহনদাসের মতন মানুষকে- তনুজার একজন গ্রেট সোল বলেই মনে হয় । ওর দুটি মেয়ে, ওর দলেই বাজাতো ।মাটিতে রেখে ওরা আসল ঢাক আর স্কন্ধে নিয়ে নকল ঢাক বাজাতো । দুটোর আওয়াজই মিষ্টি । আসলটি একটু গম্ভীর আর নকলটি একটু মেটালিক্ ।

খুব পোক্ত ঢাকিরা -তফাৎ বুঝতে পারতো । তো সেই দুই মেয়ে, আজ অনেক শহরে বাজিয়ে নাম কিনেছে ।

শ্যামা আর সন্ধ্যা নাম তাদের । ছোট থেকেই ওদের বাবা, ওদেরকে নিয়ে যেতো পুজোর আসরে । লোকে

বলতো :: আরে দুটি শিশু আর মেয়ে । ওরা বাজাতে পারে নাকি ?

কিন্তু ওদের বাবা মোহনদাস খুব কন্‌ফিডেন্ট, এই ব্যাপারে ---হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবে ! মেয়েরা কিনা করছে এখন ?

তারপর যখন আসর শুরু হতো, তখন ওদের দেখার জন্য লোক জমে যেতো । **নীলকুঠির ক্ষুদে ও দুঁদে সেলিব্রিটি বলা হতো ওদের ।দুই ক্ষুদে মানুষ, ইয়া ঢাক নিয়ে ড্রিম্ ড্রিম্ বাজিয়ে চলেছে ।**

কত মানুষের ছবি ভেসে আসছে চোখের সামনে ।

ফুলবৌদির সাথে শেখরদার বিয়ে দিলো না শেখরদার পরিবার । তনুজার পড়শী ছিলো শেখরদা । আর ফুল নামক মেয়েটি ওদের গোয়ালে কাজ করতো । বিয়ে নাহলেও ওকে সবাই শেখরের স্ত্রীর মতনই দেখতো আর বৌদি বলতো । সারাজীবন কুমারী হয়ে থাকে ফুলবৌদি-- শেষপর্যন্ত মারা গেলো পেটের অসুখে । পেট ফুলে ঢোল ! মনে হচ্ছে যেন সে গর্ভবতী । সন্তান হবার সময় এসে গেছে তার ! এমনই ব্যামোতে ধরে । তবুও মৃত্যুর আগে ফুল বলতো :: **আমার**

বিয়ে নাহয়েও আমি সারাজীবন বৌদি হলাম আর সন্তান না হয়েও প্রেগন্যান্ট মেয়ের মতন মরলাম ।

পরে তো পূর্ণিমা রাতে , থৈ থৈ জোছনার আলোয় নিভে গেলো ফুলের জীবনদীপ । কোথাও আলো, কোথাও আঁধার --এমনই বুঝি হয় !!

পচন ধরা শরীর কেউ ছুঁতে চায়নি । তখন ওকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায় শেখর ও তার সখার দল । বাড়ির কোনো নিষেধ না শুনে । শেখরের বৌ পালোমাই , নাকি এই সাজেশান দেয় । স্বামীকে বলে যে হিন্দু ধর্মে একসাথে দুই স্ত্রী কেউ রাখেনা কিন্তু মৃত নারীকে সিঁদুর দিলে তো তা বে-আইনি হবেনা ! যদি এইটুকু তুমি না করো তাহলে হয়ত ফুলের আত্মা কোনোদিনই শান্তি পাবেনা । তুমি ওকে এইভাবে সাজাও ; আর কথা দিচ্ছি আমি পরজন্মে তোমাদের দুজনের মাঝে আসবো না ।

মৃত্যু দেখলে শৈশবে খুব ভয় লাগতো তনুজার ।

অনেক কিছু মনে হত । এখন ভয় কেটে গেছে ।

আসলে নীলকুঠিতে ও কমল কাকাকে দেখেছিলো । ওদেরই দূর সম্পর্কের কাকা । সে তার বৌ আর দুই মেয়েকে নিয়ে ওদের বাসায় ওঠে । বাবা সবাইকেই রাখতো আর কোনো না কোনো কাজ জুটিয়ে দিতো ।

এই দূর সম্পর্কের ভাইটি কাজ বলতে কিছু করতো না । খালি হকি খেলে বেড়াতো । ওদের বাসায় খেলাধূলো ছিলো পুজোর মতন পবিত্র । তাই ওকে বাবা কোনোভাবেই আটকায়নি , নিষেধও করেনি কিন্তু ওর স্ত্রী নলিনীকে, লোকাল স্কুলে একটা কাজ খুঁজে দেয় । সেখানে নলিনী টিচারি করতো । সকালে উঠে তাকে যেতে হতো । দুপুরে বাড়ি ফিরতো । দুই মেয়ে, তনুজার মায়ের কাছেই বড় হয়েছে । ছবি আর রুবি ।

ছবি, সি-এ হয় আর রুবি এক তামিল পুরুষকে বিয়ে করে মাদ্রাজে চলে যায় । ওরা নাকি ওখানে হোটেল খুলেছে । সেই তামিল যুবকের ফার্মে ছবি ; সি-এর অ্যাসিস্টেন্টশিপ্ করতে যায় । মালিক হয় জামাইবাবু । হয়ে ওঠে মালিকের আধি ঘর-ওয়ালি !!

রোজ সকালে উঠে তনুজা দেখতো যে নলিনী কাকি স্কুলে চলে গেছে । কাকভোরে , কাজে চলে যেতো । এমনকি বাসায়, অনেক রাত করে কোনো আসর বা অনুষ্ঠান হলে যেমন ভাই ফোঁটা , কাকি সন্ধ্যার সময়ই শুতে চলে যেতো । কারণ স্কুল । একদিনও ফাঁকি দেয়নি । কিন্তু কাকার মুড অফ্ থাকলে , হকি স্টিকের বাড়ি খেতে হতো । বেদম প্রহার , হকি স্টিক দিয়ে । রাতভর মার ।

নলিনী কাকির সারাদেহে মারের দাগ ছিলো । তবুও স্বামীর খেলা দেখতে যেতো, মাঠে ।

পরে ঐ কাকার, অন্য এক নারীর সঙ্গ ভালো লাগতে শুরু করলে , কাকির সাথে দূরত্ব বেড়ে যায় । তবে বিচ্ছেদ হয়নি । সেই কাকি বলতো , মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা । মৃত্যু আমার মুক্তি , শান্তি । ওর পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় দিন গুনছি ।

তখন তনুজা, অল্প বয়সী হলেও বোঝে যে জীবনে মৃত্যুরও ভীষণ প্রয়োজন আছে । নিজেকে রি-ফুয়েল করার নাম মরণ । একে ভয় পাবার কিছু নেই । নিজের চেতনার আরেকটি ডায়মেনশান এটা ।

মন্দিরা দিদি খুব ছোট থেকে খোলামেলা পোশাক পরতো । লেখাপড়ায় অশ্বডিম্ব । কিন্তু ভালো খেলতো । ভলি বল । চ্যাম্পিয়নও হয় । কিন্তু স্কুল ফাইনালটা ৫৪০ পেয়ে পাশ করে । তখন তাতেই ফার্স্ট ডিভিশান হতো । তাই তার মা জননী সবাইকে বলতো :: ফার্স্ট ডিভিশান পাওয়া একটি ভালো ছাত্রী , পরে আর পড়লো না !

দু:খ করতো ওর মা শিখা । আসলে পড়বে কি ? খেলা থেকে কিঞ্চিৎ নাম হওয়ায় সে দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে । তাকে এই চক্রে নিয়ে যায় এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার । পরে সেই ম্যানেজারকে তার বাড়িওয়ালি ঘর ছাড়া করে । রাস্তায় ছুড়ে ফেলে তার সমস্ত জিনিসপত্র আর স্ত্রী ও মেয়েকে । কারণ এইসব কুচক্রে জড়িয়ে পড়ে লোকটি বাড়ি আসা ও ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে । **মধুচক্র হয়ে ওঠে বিষবৃক্ষ ।**

ওদের বাড়ি থেকেই জীবন শুরু করে নিতাই চন্দ ।

গ্রাম থেকে আসা নিতাই ; ওর গ্রামের বাড়িতে রেখে আসে বৃদ্ধ বাবা আর অজস্র ভাইবোন । ওদের বাড়ি থেকেই শুরু করে নেলপালিশের ব্যবসা । পরে ব্যবসা বেড়ে গেলে সে অন্য লোকালয়ে চলে যায় । কিন্তু প্রতিটি রবিবার সে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ওদের বাসায় আসতো । ফুলও আনতো । বাবার পায়ে দিতো ।

বাবা না করলেও শুনতো না । **বলতো , আপনি আমার কাছে ভগবান ; বড়দা !**

ও বাবাকে অনেকের মতন বড়দা বলতো ।

নিতাই ; শুরু করে ক্যাটক্যাটে লাল রং এর নখ পালিশ দিয়ে । আস্তে আস্তে ওর বিকিকিনি বাড়লে ও গোলাপী, মেরুন ইত্যাদি রং নিয়ে আসে । তখন এই তিন ধরণের রং-ই পাওয়া যেতো । এখনকার মতন সহস্র কালার ছিলো না, হাতের কাছে । নিজে পথে পথে ঘুরে প্রথম দিকে ফেরিও করেছে । পরে অবশ্য দোকানে সাপ্লাই দিতো ।

তবুও তার আত্মসম্মান ছিলো । কেউ একবার গালি দিলে, তার মুখদর্শন করতো না আর ।

বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময়, নিতাই-- মেয়েদের সমস্ত সাজার জিনিস নিয়ে আসতো । ছোটখাটো একটা মেলা হতো বাড়ির কম্পাউন্ডে । কাঁচের চুড়ি , দুল, পায়ের আংটি বা আঙোট্ , মাদ্রাজী টিপ , কুমকুম, প্লাস্টিক চুড়ি , নাকছাবি---- কী না থাকতো ! আর নখ পালিশ !!!

মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে সব নিতো । নিতাই কিন্তু পয়সা নিতো না । বলতো , পুজোর সময় বাবার থান থেকে কি টাকা নিতে পারি ?

ওদের একটা বিশাল , বিদেশী ডজ্ গাড়ি ছিলো । অনেকে বসতে পারতো । সেই গাড়ি করে ওরা মাঝে মাঝে নদীর হাওয়া খেতে যেতো । যে গাড়ির সারথী,

সেই দিলীপ-দা সবসময় ওদের বাইরে থেকে চা, চপ্ কিনে খাওয়াতো। কিন্তু সামান্য মাইনের চাকরি হলেও কোনোদিন ওদের কাছ থেকে চায়ের পয়সা নিতো। সব ফ্রি। চা, চপ্, ঘুগনি যা খাও সব।

দিলীপদা অবশ্য ওদের বাসায় থাকতো আর বাবার একটু ম্যানেজারিও করতো। পাশের বাড়ির মেয়ে আলিয়া , যার বাবা বিলেৎ ফেরৎ আইনজ্ঞ ছিলো সেই আবিদ হোসেন সাহেবের- একমাত্র মেয়েকে ইলোপ করে বিয়ে করে। আবিদ হোসেন একটা তুলকালাম করে। বাবাকে এসে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে যায়। বলে :: মশাই, বাড়িটাকে একটা ধর্মশালা করে রেখেছেন। যার খুশি আসছে, থাকছে। আর তার কোপে পড়ছে আমাদের ফুলের মতন নির্মল মেয়েরা।

বাবা অনেক বোঝায় যে- যা হবার তা তো হয়েই গেছে। দিলীপ সৎ ও খাটিয়ে। ওকে একটা নতুন ব্যবসা করে দিলেই ও অনেক ওপরে উঠে যাবে।

কিন্তু ভদ্রলোকের স্টেটাসের ব্যাপার আছে ! তবুও শেষ অবধি বাবা- ঐ দিলীপকে বড় দুটি ম্যাটাডোর কিনে দেয়। সেই দুটি ভাড়া দিয়ে দিয়ে দিলীপ , পরে বড় ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাদার হয়ে ওঠে। ছেলে মাজিদ ডাক্তার হয়। মেয়ে নীলাঞ্জনা হয় আই-এ-এস।

ওদের নীলকুঠি অনেক চেতনাকে ; মানুষ করেছে ।

মানুষী দেববর্মা, আসে ত্রিপুরা থেকে । এক আদিম জনজাতির মেয়ে । কলকাতার চমক ধমক দেখে আসে । প্রথমে ওদের বাড়িতে ওঠে । ওখান থেকে প্রাইমারি টিচারের ট্রেনিং নিয়ে, লোকাল স্কুলে যোগ দেয় ।

সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলো তনুজার পূর্বপুরুষ । সেখানেই চাকরি পায় মানুষী ।

অবসরে ; মানুষী- অশিক্ষিত মানুষের বাচ্চাদের, ওদের পুরোনো গোশালায় বসিয়ে পড়াতো । ওদের ডিমের ওমলেট্ আর মিষ্টি দিতো, ক্লাস শেষ হলে । নাহলে ওরা আসতে চাইতো না ।

ওদের বাপ্-মায়েরাও পাঠাতে চাইতো না । বলতো, ছোটলোকের বাচ্চা ছোটলোক হবে , কুত্তার বাচ্চা আরেক কুত্তা । অত পড়ানেকা শিকে হবে কী ?

সবাই এত্তো পড়লে, ঝি-চাকরের কাজ করবে কারা ?

বাবা ও মায়ের আপত্তি থাকলেও খাবারের লোভে বাচ্চাগুলো ঠিক গোধূলিতে গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির হতো ।

মানুষী তো বিয়ে করেনি ।ও তখন কলকাতায় থাকে ! বাংলার বাইরে আসানসোলও হয়ে ওঠে কলকাতা । ত্রিপুরাতেও সে মাঝে মাঝে যেতো । আর এইসব শিক্ষকতা ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত রাখতো নিজেকে ।

শোভার গায়ে ; কেরোসিন ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারে যাদব । যাদব ওদের গোয়ালের রাখাল । ওকে বাবা অনেক পড়ায় । বুদ্ধিমান কিশোর ছিলো সে । পরে **আই আই টি থেকে নৃতত্ত্ব বিদ্যা** নিয়ে গবেষণা করে । শোভাকে পুড়িয়ে মারে কারণ সে যাদবকে ছেড়ে চলে যাবার প্ল্যান করে । বাচ্চাকে ফেলে রেখে । শোভাও **আই আই টি** থেকে এসেছিলো ।

বাবার প্রিয় পাত্র হওয়া সত্ত্বেও, নিজের স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অপরাধে বাবা ওকে ত্যাগ করে । নীলকুঠিতে আর প্রবেশের অধিকার ছিলো না তার ।

বয়সে তনুজার চেয়ে অনেক বড়, লোকটিকে ওরা কাকাই বলতো । যাদব কাকা নাকি শেষ সময়ে নীলকুঠির সামনে আগুনে পুড়ে মারা গেছে । নিজেই নিজের গায়ে আগুন দেয় । বাচ্চাটি তখন কিশোর । তাকে নীলকুঠিতে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় । **বলে যায় ::**

বড়দা আমাকে ত্যাগ করলেও, ওকে ত্যাগ করেনি । কাজেই নীলকুঠিই ওর আপন ঘর ।

পরে বাবা, ঐ কিশোরকে--- পাহাড়ের এক মিশনারি স্কুলে রেখে পড়ায় । সে এখন পাহাড়েই কাজ করে । ভালো ছাত্র ছিলো, ওর বাবার মতন কিন্তু বিদেশ-টিদেশ যাবার সুযোগ এলেও সে যায়নি ।

তনুজাদের বলতো :: দি-ভাই , বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ আমার নেই । আমি যেরকম সেই হাইট অনুসারেই জীবন কাটাতে চাই । নিজের কতটা প্রাপ্য আমি বুঝি । আর সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশের কী হবে ?

সত্যি তো , দেশের কী হবে ! তনুজা তো এমন করে ভাবেনি কোনোদিন । নিজের তীরন্দাজি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে ও অনাবাসী হয় । সফলও হয় । কিন্তু এত কিছু ভাবেনি কখনো । যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই যেতে হবে ; যদি জীবনে কিছু করতে হয় । এরকম ভাবেই চিরটাকাল ভেবে এসেছে । ওকে অনেক বান্ধবী বলতো ::: হ্যাঁ রে , তোদের গোত্র কী ? আমরা সব তো নানান ঋষি থেকে এসেছি । তোরা গোয়ালারা কোথা থেকে এসেছিস্ ? ছোট জাতদের গোত্র হয় নাকি ? তোদেরটা কী ? গোমাতা গোত্র ?

দু:খ হতো তনুজার । ওর বাবা বলতো ::: বলবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর । আমরা হরির বংশ , নারায়ণ জাত , কৃষ্ণ কন্‌শাস্‌নেস্‌ ।

ওর আপন কাকা মহিন-এর দুই মেয়ে ছিলো । নীলকুঠিতেই থাকতো তারা । রোহিনী আর মোহিনী ।

এর মধ্যে মোহিনী, জ্যোতিষ করতো । হাত দেখা , কুষ্ঠি বিচার করা আর গ্রহ- নক্ষত্রের জন্য নানান বিধান দেওয়া ইত্যাদিতে বেশ হাত পাকায় । অল্প নামডাক হয় । দূর -দূরান্ত থেকে লোক আসতো ওর কাছে।

ওর ডাক নাম ছিলো মিনু । তাই **মিনুর কুটির** নাম দিয়ে, রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় সে অ্যাস্ট্রোলজির কাজ করতো- নীলকুঠির এক কোণায় ।

আজন্ম কৃষ্ণ ভক্ত, ওর বাবা ও মা । তাই মেয়েদের এরকম নাম রেখেছিলো । ভগবান বিষ্ণুর অবতার মোহিনী । আর রোহিনীর কথা সবাই জানে ।

কিন্তু কোথাও হয়ত কোনো ঘাটতি ছিলো । তাই পাড়ার উঠতি মাস্তান বিজন, ওরফে বিজু একদিন মোহিনীকে ধরে নিয়ে যায় । নীলকুঠির কারো গায়ে হাত দেবার সাহস কারো ছিলোনা । এতই তাদের

প্রতিপত্তি ছিলো । নীলকুঠি ; ওদের এলাকার এবং সমাজের একটি মাইলস্টোন ছিলো । কিন্তু বিজন তখন সবে মাস্তান হিসেবে নাম করছে আর ওর পন্থা হল কমিউনিজম্ । কাজেই এইসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেবার কোনো মানেই হয়না । তাই মোহিনীকে ধরে নিয়ে গিয়ে গ্যাং রেপ্ করে ক্যাডারদের মধ্যে ফেলে দেয় । আরো রেপ্ হয় ; অবশেষ সে মারা যায় । লাস্টে ওর গায়ে লেবেল শেঁটে দেয় , **নিজের হাত দেখেনি দেবী খনা , এসব বজ্জাতিতে মোরা ভুলবো না ।**

ভেঙে পড়ে নীলকুঠি !!!

বাবা ভীষণ ক্ষেপে যায় । কিন্তু বাবার বড় ফার্ম ও গোশালা কাজেই বামপন্থী মানুষেরা সেখানেও ছিলো । বিশেষ করে ইউনিয়ন লিডার পরিতোষ বসু । খুবই ভদ্রলোক আর সত্যিকারের শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতো । পরিতোষ গিয়ে ওদের হাই কমান্ডকে জানায়

। ওরা বিজনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় । বিজন আসলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো । সেখান থেকেই এইসব রাজনীতির ভূত ওকে ধরে ।

শেষে মাস্তানি করে করে, এমন অবস্থা হয় যে ওকে ডাকযোগে অংক নিয়ে মাস্টার্স করতে হয় তাও দক্ষিণের কোনো এক ইন্সটিটিউট্ থেকে ।

দক্ষিণে তো লোকে তাদের অর্জিত, সব ডিগ্রী লিখে রাখে নেমপ্লেটে । বিজন নাকি বলতো যে ওখানে যে এম-এ পাশ সে বি-এ পাশ নাও হতে পারে আবার যে বি-এ পাশ সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ নাও হতে পারে । কারণ ওখানে ডাইরেক্ট এম-এ, বি-এ, এসব করা যায় । তাই সবাই ডিগ্রী লিখে রাখে ; যাতে লোকে না ভাবে যে সে ডাইরেক্ট, ডাকযোগে পাশ করেছে ।

তনুজা কিন্তু তীরন্দাজ হলেও আগে বি-এস-সি (বটানি), পরে কাজে ঢোকার আগে বি-কম আর মাঝেখানে এক পরিচিত , ডাকযোগে বি-এ করার জন্য সমস্ত কিছু আনালেও করে উঠতে পারেনা । বি-এ পাশ করা নাকি অসম্ভব কঠিন । বি-এতে ফার্স্ট হওয়া হয়ত শক্ত কিন্তু নোটস্ মুখস্থ করে পাশ করা কেন কঠিন আজও বোঝেনি তনুজা । ওই তখন সেই কোর্সটা করে ফেলে ।

তাই ও আদতে বি-এ, বি-এস-সি আর বি-কম তিনটেই পাশ । বি-কম করে তীরন্দাজিতে স্কুল খোলার আগে । হিসেব নিকেষ, নিজের ট্যাক্স ফাইল করা ইত্যাদি করার জন্য । এখন তো নানান স্টুডেন্টকে ট্রেনিং দেওয়া আর বিভিন্ন কন্টেস্টে জাজ্ হয়ে যাওয়া ওর অবসর বিনোদনের জিনিস । অন্য সময় নানান সমাজ সেবা-সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করে ।

ওদের বাসা নীলকুঠি হয়ত নেই কিন্তু স্মৃতিগুলো ঝুলে আছে ঐ বহুতলের আনাচে কানাচে । ওখানে সুপার মার্কেট হয়েছে । আর পাঁচটি বিরাট বিরাট অট্টালিকা । ধানী জমিগুলোতে খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ক্লাব , জিম্ এইসব হয়েছে । খুব সুন্দর কমপ্লেক্স-টি।

নাম দিয়েছে নীলাঞ্জন ছায়া । তনুজার একটু বেশি ভালোলাগে , ওর নিজের জীবনের মূল্যবান সময় ওখানে কেটেছে বলে ।

আবার মনটা ভারাক্রান্তও হল ! মনে পড়ে গেলো সমাপ্তির কথা ! সে ওদের গোয়ালে কাজ করতো ।

দুধ বিক্রি করতো লোকাল মানুষকে । কোন সে এক গ্রাম থেকে আসে । সুন্দরী মেয়েকে সিনেমায় নামাবে বলে নিয়ে আসে লোকাল দাদা । কিন্তু নায়িকা সবাই

হতে পারেনা । রূপ থাকলেও । নায়িকা হবার জন্য অন্য অনেক গুণ চাই ।

তাই ধীরে ধীরে সে অনেক নীচে নামতে শুরু করে ।

শেষে ওদের নীলকুঠির এক কর্মী , মদের ঠেক থেকে মেয়েটিকে নিয়ে আসে। **সমাপ্তি নাম দেয় ওর বাবা ।** নতুন জীবনের শুরু । ওল্ডের সমাপ্তি । এই ছিলো লজিক । লোকে তখন ওর বাবাকে ধিক্কার দিতে শুরু করে । এক নষ্ট মেয়েকে জায়গা দিয়েছে বলে । লোকে বলে :: আপনি গোয়াল চালান না বেশ্যালয় ? এইসব আজেবাজে মেয়েমানুষকে কেন ঘরে তুলছেন ?

বাবা ছিলো একইসাথে অত্যন্ত কঠোর আর কোমল ।

কাজেই বলে যে-- নষ্ট করেছি আমরা । পুরুষেরা । ও এখানেই থাকবে । সেরকম মনে হলে, আপনারা আর দয়া করে দুধ নিতে এখানে আসবেন না ।জীবনে কারো উপকার করতে না পারেন , অনিষ্ট করবেন না । ও একটু আশ্রয় চেয়েছে মাত্র আর কিছু নয় । আর কেষ্টর জগৎ এটা, এই নীলকুঠি । ভগবানও যদি ওকে ফেলে দেন ও যাবে কোথায় ??

সমাপ্তি পরে ভীষণ ভীষণ মোটা হয়ে যায় । নানান হরমোনের প্রভাবে । অল্প বয়স থেকে বার্থ কন্ট্রোল পিল খেতে শুরু করে । অনেকবার ওষুধ খেয়ে

গর্ভপাত করায় । হয়ত তাই কে জানে ? একদিন হঠাৎ সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । কতই বা বয়স তখন ? ত্রিশের কিছু বেশি !

পরের দিকে সে নীলকুঠিতে থাকলেও, ঐ এলাকাতেই এক জুতোর কারখানায় কাজ করতো । সেই ফ্যাক্টরি চালাতো চীনারা । নামঃ: পদম্ চি্। তা নাহলে ওকে আর কেউ গ্রহণ করতো না ; যারা বাঙালী ইত্যাদি । চীনাদের এতে কিছু যায় আসেনা । ওরা ভীনদেশী । তাই ওদের এক ফ্যাক্টরিতে ওকে ঢুকিয়ে দেয় তনুজার বাবা ।

+++++++++++

রাতের বেলা , ক্ষেতে শস্য চুরি হতো । তাই পালা করে করে নীলকুঠির অনেক লোক ; রাতে ঐসব ক্ষেতে গিয়ে থাকতো । টিনের চালের বেশ কয়েকটা ঘর । অনেকে খাবার নিয়ে যেতো । কেউ খেয়ে যেতো । অনেকে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যেতো। অনেকে ওখানেই কাঠকুঠো জ্বালিয়ে চা বানাতো ।

তবে বেশিরভাগ সময়ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেতো মোট চারজন । কিন্তু দেখা যেতো যে মন্টু নামক এক ব্যাক্তি রেগুলার ওখানে রাত কাটাতে আগ্রহী । একটু

পালোয়ান গোছের ছিলো সে । সুপুরুষ-ও । তনুজার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ; যার কোনো ঘর নেই তাই নীলকুঠিতে থাকে ।

অনেক মেয়ের চোখের মণি মন্টু , সমাপ্তিকেই বিয়ে করবে স্থির করে । ওকে নিয়েই নাকি ক্ষেতে রাতগুলো কাটাতো সে ।

সমাপ্তির পাস্ট আছে তাই লোকে শুনেও কিছু বলেনি । অনেকে মতামত দিয়েছে যে শিবেন ঘোষ , নীলকুঠিকে ; বাঈজির কুঠি করে ফেলেছে ।

এইসব কুকথা শুনে সমাপ্তি বলতো , আমি মন্টুকে ভালোবাসি । আমার কি ভালোবাসতেও নেই ? আর বেশ্যা ও বাঈজি যে এক নয় তা ওদের জানা দরকার । তারপর বলবে আমি কোনটা !

সমাপ্তির আসল নাম ছিলো পূরবী । এত সুন্দর নামটা আর কেউ জানতে পারবে না ভেবে তনুজার দু:খ হতো । তবে কোনো এক সংস্কারের কবলে পড়ে সে এই মেয়েটিকে এড়িয়ে চলতো । লোকের অপবাদ না মানলেও সে মনে করতো যে বাবা একটু বেশি মুক্তধারাতে বিশ্বাসী ।

যখন ওদের গোয়ালের মাধাইদা, লিভার ফেটে মারা গেলো-- মদ্যপান করে করে তখনও তাকে দেখতে যায়নি তনুজা ; ঐ মেয়ে সেখানে ছিলো বলে ।

মাধাইদা , ওকে কোলে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতো । লজেন্স , আইসক্রিম , সেন্ট রাবার এসব কিনে দিতো । সব ভুলে গেলো । শেষবারের মতন দেখা হলনা । যখনই খবর দিতো তখনই মাধাইদা এসে বলতো :: দিদিমণি , বলো কী আনতে হবে !

ও গাছে চড়তে পারতো না তাই অনেক ভালো ভালো ফল পেতনা । অন্যরা নিয়ে নিতো । মাধাইদাই ওকে বুদ্ধি দেয় যে একটা সিঁড়ি লাগিয়ে গাছের ফল পেড়ে নাও । **সেরকম করে করে ;পরের দিকে বহু রসালো ফল খেয়েছে তনুজা ।**

পাখি-- তীরের ফলায় বিঁধলে ; ঐ মাধাইদা গিয়েই বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে কুড়িয়ে আনতো । সমস্ত দস্যিপণা আর আবদারের শেষ হত ওর ; মাধাইদার কাছে ।

তার শেষযাত্রায় কিন্তু তনুজা গেলোনা । অনেকে বললো :: যতই আশ্রম খুলুক আসলে ওরা ধনী । তাই গরীবদের ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত আর জানেও কেবল সেটাই । মাধাই তো মরে গেছে । ওখান থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই । তাই দিদিমণি গেলেন না

। অথচ জ্যান্ত থাকতে এই মাধাই-ই ; কী না করেছে তনু দিদিমণির জন্য !!!

আসলে এক কবি ওকে প্রেমপত্র দেয়, যখন ওর বয়স মাত্র- ১৩ । নাম তার অশনি সংকেত । তাকেও শাসায় সেই মাধাই । **বলে :: বড়বাবু তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন । এসব জানলে তোমার বাস উঠবে !**

ওর কাজিনদের গিয়ে মাধাই বলে যে ঐ কবি তনুদিদিকে লাভ লেটার দিয়েছে । শুনে ওরা বলতো :: ওরই তো বয়স । তোমাকে দেবে নাকি ?

ওর কাজিনেরা তনুজাকে ক্ষ্যাপাতো :: কোন পাগলা কবি তোকে কবিতা লিখে দিয়েছে রে ? এসব তো রিক্সার পেছনে লেখা থাকে !

শিশিরে কি ধান হয় , বর্ষা না হলে ?

দূর থেকে কি প্রেম হয়, কাছে না এলে ?

তনুজার যে একেবারেই ভালোলাগেনি তা নয় কিন্তু একটা চালচুলোহীন , সস্তার কবির গলায় মালা দিচ্ছে ও ভাবতেই পারেনা । আর এমনিতেও ও কবিদের দুচোখে দেখতে পারেনা । লেখক তাও চলে ,

কবিগুলো একেবারে হোপ্‌লেস্‌ । যা লেখার কবিগুরু লিখে দিয়ে গেছেন আর কী লিখবি তোরা ?

--এসো, বসো, মোবাইল কৈ ?

চারদিকে বিজলী থৈ থৈ ,

ঐ দেখো আসছে- আলোর মোটরগাড়ি ,

উধাও হয়ে গেলো ময়নার সূর্য প্রণাম !

আচ্ছা , পিপাসাকে চেনো ? ও কে তা জানো ?

জল খাবে ?

এইসব কবিতা লিখতো ঐ ব্যাক্তি । পরে অবশ্য বাবা ওকে তাড়িয়ে দেয় । মদ খেয়ে মাতলামো করছিলো আর বাবাকে গালি দিচ্ছিলো বলে :: শালা, শুয়োরের বাচ্চা শিবেন ; তোর মেয়ের গুদ্‌ যদি না ফাটাই তাহলে আমার নাম অশনি নয় রে ! তুই কি আমার বাড়াকে ভয় পাস্‌ ? দেখ্‌ শালা কত্তো বড় হয়েছে !!! রোজগেরে নই বলে কি আমার বাড়া ৬ ইঞ্চির কম ?

এইসব কুকথা ও গালি শুনে বাবা ওকে তাড়িয়ে দেয় । বলে :: এক অসহায় মেয়েকে রেখেছি বলে লোকে বলছে আমি বেশ্যালয় খুলেছি । কুঠি নয়- কোঠি

আমার এই বাড়ি । আর এক শিক্ষিত , মার্জিত, শোভন মানুষের মুখের ভাষা দেখো ! তাও এক নাবালিকার জন্য !!!

তনুজার কাজিনেরা বলতো :: ব্যাটা, নির্ঘাত পানু কবিতা লেখে । খিস্তি আর খ্যামটার বোল দিয়ে ।

কাছা খুলে খিস্তি দিয়েছে আর মালিকের মার খেয়েছে !!! কারা কারা যে চলে আসে এখানে আর ক্ষতি করে দিয়ে চলে যায় ।

তনুজার বাসায় খেলাধূলোর খুব চল ছিলো । মোটামুটি অনেকেই, কিছু না কিছু খেলার সাথে যুক্ত ছিলো । এরকম এক মানুষ হল ওর বাবা , স্বয়ং ।

বাবা খুব ভালো বক্সার ছিলো । ওদের জমির মধ্যেই বক্সিং ক্লাব করে, সেখানে নিয়মিত বক্সিং করতো । ক্লাবের নাম ছিলো হনুমান সঙ্ঘ ।সেখানে অনেক খেলোয়াড় থাকলেও- বাবাই প্রতিবার চ্যাম্পিয়ন হত । তবে ঘুষ দিয়ে নয়, প্রতিভার জোরেই । বাবা বলতো , মাইক টাইসন আমার যমজ ভাই !

ওর মায়ের বয়ফ্রেন্ড, গৌরহরিও বক্সিং করতো । কিন্তু বাবার সাথে কোনোদিন ওর মাকে নিয়ে যুদ্ধে নামেনি ।

ও হয়ত ভাবতো যে বাবা, নেহাৎ-ই বোকা এক স্বামী । তার পিঠে ছোরা মারলেও সে কিছু আন্দাজ করতে পারবে না । তাই বাবাকে যথেষ্ট তেলিয়ে চলতো । বাবাও কিছু বলতো না ওকে, সরাসরি ।

পুজোর পরে, বক্সিং কম্পিটিশন হয় নিয়মিত । তখন শরৎকাল । দুগ্গাপুজো সবে শেষ হয়েছে । সেখানে একদিন ফাইনাল রাউন্ডে বাবার সাথে খেলার কথা গৌরহরির । ও অন্যান্য বার প্রথম দিকেই হেরে যেতো । সেইবার কী যে হল সে একেবারে ফাইনালে উঠলো । বাবা তো প্রতিবারই জেতে- কাজেই সবাই ভাবলো এবারও বাবাই জিতবে ।

কিন্তু গৌরহরি জিতে যাচ্ছিলো প্রায় । তবে শেষ সময়ে বাবার এক বেকায়দা মারে সে মঞ্চেই ঢলে পড়ে আর হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষিত হয় ।

নীলকুঠি জুড়ে আনন্দ হলেও লোকে কানাঘুষো করতে শুরু করে যে প্রতিদ্বন্দীকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলেছে বাবা । বক্সিং রিং এর মারপ্যাঁচে, সে আহত নয় একেবারে নিহত হয়েছে । তবে ব্যাপারটা প্রমাণ সাপেক্ষ তাই এই নিয়ে জলঘোলা হয়না , প্রত্যেকের মত-- তার মনেই থেকে যায় । মা সেদিন কেঁদেছিলো বটে ।উপুড় হয়ে, গৌরহরির বুকে শুয়ে সে কি কান্না !

এরকম ঘটনা দেখে তাজ্জব হয়ে যায় তনুজা । খুব অড্ লাগে, মায়ের এই ধরণের বুকে শুয়ে কান্না !

গৌরহরি নাকি হুইস্কি খেতো । মা নিজে হাতে ড্রিঙ্ক বানিয়ে দিতো । আর তাতে সে তরমুজের রস বা আপেলের রস দিয়েও পান করতো । সেই সমস্ত রস মা নিজে হাতে বানিয়ে দিতো । লোকে মনে করতো মা গিন্নীমা, তাই ড্রিঙ্ক বানিয়ে দিচ্ছে- পরিচিতকে। কিন্তু বাবা, এগুলো বিষ নজরে দেখতো ।

গৌরহরি মারা যাবার পরে, ওর লাশ ইত্যাদির সৎকার করে নীলকুঠির কিছু যুবক । আর মা এরপরে উন্মাদ হয়ে যায় ।

ওদের কোনো এক পূর্বপুরুষ , বাংলার এক নবাবের কাছ থেকে একটি বহুমূল্য উপহার পেয়েছিলো । ওরা লেঠেল ছিলো । তাই একটি স্বর্ণ, রৌপ্য, চুণী , পান্না খচিত -চার ফুটের মোটা লাঠি ; ওদের বংশের মানুষকে দেয় নবাব। সেই লাঠি ছিলো ওদের গর্ব । বাবা , প্রতিবার পুজোতে লেঠেল এনে তাদের খেলার আয়োজন করতো । সেই লাঠি খেলার আগে, ঐ বিশেষ লাঠি দেখানো হতো সবাইকে । কিন্তু সেই লাঠি একদিন

চুরি যায় । শুনলে অবাক হতে হয় যে চোর আর কেউ নয় একটি ৮-১০ বছরের বাচ্চা মেয়ে , ভূতি ।

ভূতি ছিলো ; ভূতের মতন কালো ও কুশ্রী ।

কিন্তু অসম্ভব চতুর ও বিশেষ ক্ষমতাধারী । তাই লোকে ওকে ভূতি না বলে চতুরা বলতো ।

সেই ভূতির বিশেষ ক্ষমতা হল যেকোনো বই একবার দেখলে হুবুহু বলে দিতে পারতো । একেবারে ডট টু ডট । তাই নীলকুঠির অনেক ছাত্র-ছাত্রী , ওকে পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতো । ও বেঞ্চের নীচে বসে থাকতো আর উত্তর জিজ্ঞেস করলে বলে দিতো ।

ও আকারে ক্ষুদ্র হওয়ায় ওকে সহজে কেউ লক্ষ্য করতো না । এইভাবে অনেকে পাশ করেছে । পরে ওর মাথায় কী চাপে যে একদিন রাতে বাবার ঘরে ঢুকে ঐ লাঠি চুরি করে পালাবার চেষ্টা করে ।

তবে নীলকুঠির গোয়ালে কাজ করা কিছু মানুষ ওকে ধরে ফেলে আর এমন মার দেয় যে ও ঘটনাস্থলেই মারা যায় । সেই খুনের দায় চাপানো হয় আধপাগলা কর্মী সুখেন শেখের ওপরে । সুখেন একটু ছিটিয়াল ছিলো । সদা সত্য কথা বলা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে ভালো গুণ বলে মনে করতো আর তাই করার চেষ্টা করতো । ক্ষ্যাপাটে সুখেন শেখ আদতে মুসলিম

। ওর আসল নাম সেলিম । বাবা ওকে সুখেন নাম দেয় । একবার একটি পিকনিক হয় ওদের প্রপার্টিতে । বড় বড় দিঘী ছিলো । সেখান থেকে মাছ ধরে তাই রান্না করে খাওয়া হয় । পরিবারের লোক ছাড়াও অনেক কর্মী ছিলো সেখানে । শীতের রোদে বসে কেউ উল বুনছে কেউবা এমনি রোদ পোহাচ্ছে । রান্না হয়ে এসেছে । সবারই পেটে দারুণ ক্ষিদে ! বিকেল হবো হবো করছে । একটু পরেই রোদ চলে যাবে । শীতের বেলা । মরা রোদে খেতে কেউ রাজি নয় কারণ মাঠে বসে খাওয়া তো ! পোকা মাকড়ের ভয় আছে ।

ঠিক তখনই সুখেন বলে বসে , পোলাউতে একটা পোকা পড়েছে , রাঁধুনি ওটা ফেলে দিয়েছে ।

আসলে ছোট পোকা দেখে, ওটা তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে । আর সেটা সবার সামনে বলাতে, লোকে ঘেন্নায় পুরো পোলাউটাই ফেলে দিতে বলে । সেই যাত্রায়, লোকের আর পোলাউ খাওয়া হয়না । মাছ আর মিষ্টি খেয়ে ; বনভোজন শেষ হয় ।

রসুইঘরে যারা ছিলো তারা পরে বলে : বল্‌দা , পাঁঠা সুখেনের জন্য পোলাউ ফেলে দিতে হল । ওরকম পোকা, রান্নায় কত পড়ে !!

নীলকুঠিতে শিলাবৃষ্টি হলে ভারি মজা হত । সবাই মিলে শিল কুড়াতে শুরু করতো । বৃষ্টি থেমে গেলে ভিজে ভিজে বাতাসে, আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প-ফায়ার করা হতো । সে দারুণ মজা !! কর্মীরা যারা ওখানে থাকতো অথবা বাড়ির ছেলেপুলেরা , সবাই মিলেমিশে কাজ করতো ।

সবথেকে মজা হতো বহুরূপী চিত্তর কান্ড-কারখানায় । নীলকুঠির একপাশে শিবেন ঘোষ ; কয়েক ঘর বহুরূপী আর পটুয়াকে বসায় । পটুয়ারা শহরে পট বিক্রি করতে যেতো আর বহুরূপীরা নানান সাজে সেজে লোকের কাছ থেকে চাল, কলা, আনাজ নিয়ে আসতো । শুধু বৃহস্পতি বার ওরা নীলকুঠিতে থাকতো । সেদিন শিলা বৃষ্টি হলে ; ওরা সেজে গুজে নানান অঙ্গ ভঙ্গী করে মজা করতো । আর রাতে নীলকুঠিতে খেয়ে যেতো । বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার বলে কেউ সেদিন ওদের পয়সা ইত্যাদি দিতে চাইতো না । তাই ওরা সেদিন অফ্-ডে করতো । বদলে নীলকুঠিতে মজা করতো । বাবাকে ওরা খুব শ্রদ্ধা করতো । বড়দা বলতো । আর ছোটদের নানান রূপে মজা দেখাতো । ওদের বাচ্চারা খুব ছোট বয়স থেকেই নিজেরা সাজতে পারতো । রং মেখে, পরচুলো পরে ,ইমিটেশানের

গয়না পরে ওরা সাজতো । কেউ মা কালী, কেউ গনেশ আর কেউবা হনুমান ।

এলাকার কুকুর ওদের তাড়াও করেছে অনেক ; বিশেষ করে হনুমান, সিংহ ইত্যাদিকে । সবচেয়ে মজা হয় একবার ওদের মধ্যে কেউ কঙ্কাল আর সাপ সাজায় ।

পুরো আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা । আর ওপর দিয়ে একটি কঙ্কালের মতন সাদা পোশাক পরা । অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলো । অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায় ওকে দেখে ; অন্যরা খুব মজা পায় পরে । জ্ঞান ফিরলে তারাও ; যারা ভয় পেয়েছিলো ।

পরে বাবা ওদের সবাইকে মোটা টাকা উপহার দেয় । অপূর্ব সাজের জন্য ।

আর সাপের ব্যাপারটা অভিনব । কেউ যে ওরকম সাপ সাজতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না ।

একেবারে সাপের মতনই আর একটু বড় সাইজের মানে অজগড় আরকি ! ধানক্ষেতের মাঝে ; আলের ওপরে আরুণির মতন শুয়ে আছে ! নট্ নড়ন চড়ন !!

বিরাট একটি সাপের খোলস বানিয়ে, তাতে এক কিশোর ঢুকে পড়ে । নাকের কাছে ফুটো ও চোখের

এলাকায় গর্ত থাকায়, শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়না । সাপের মতনই প্রায়, বুক ঘষে ঘষে চলতে শুরু করে ।

যদিও ওরা বহুরূপীদের চিনতো আর ওর বাবা তাদের থাকার জায়গাও দেয়, তবুও সাপ বা কঙ্কাল দেখে কেউই ঝট্ করে মনে করতে সক্ষম হয়না যে এগুলি খোলস্ হতে পারে, এমনই নিঁখুত সাজ ছিলো ওদের ।

নীলকুঠি ভেঙে পড়ার পরে সবাই চলে গেছে । ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে । পটুয়া আর বহুরূপীরা গ্রামে চলে গেছে । কারণ ওদের বসবাস করার জায়গার অভাব । যা রোজগার হয় তাই দিয়ে কোনোমতে পেট চলে আর থাকার ভাড়া কী করে যোগাড় হবে ?

এদের মধ্যে মিন্টু বলে একজনকে, টিভি সিরিয়ালে নামায় এক সিনেমাটোগ্রাফির ছেলে- যে নিজেও এইসব নিয়ে পড়ছিলো । একটি তথ্যচিত্র করে ওদের নিয়ে । তারপরই মিন্টু অভিনেতা হিসেবে মাইথোলজিক্যাল সিনেমায় সুযোগ পায় ।

মিন্টুকে এখন পর্দায় দেখে তনুজা । অনেক বদলে গেছে । এক শহুরে মেয়েকে বিয়েও করেছে । সে সিনেমার কেশ বিন্যাসে কাজ করে । তার নাম জাগরি ।

মিন্টু সবসময় জাগরির কথা বলে । ওর অবদান স্বীকার করে । জাগরিই ওকে নাকি আধুনিক করেছে । হাই সোসাইটিতে চলতে ফিরতে শিখিয়েছে । ওকে মানুষ ও শহুরে করেছে ; গেঁয়োভূত, বহুরূপী কিশোর থেকে ।জাগরির সাথে খুব আলাপ করতে ইচ্ছে করে তনুজার । শুনেছে মেয়েটা খুব সরল ও সহজ মানুষ । সরল অনেকেই থাকে কিন্তু জীবন তাদের জটিলতার দিকে ঠেলে দেয় । জাগরি, নিজের ইনোসেন্স মেন্টেন করতে পেরেছে । সিনেমা জগতে থেকেও । এটাই বেশি কৃতিত্বের । জাগরি জেগেই আছে, শুধু কবে তনুজাকে জাগাবে , সেটা জানে একমাত্র সময় ।

মিন্টু ; সিনেমায় নামার আগে অটোর ব্যবসা করবে বলে ঝুঁকেছিলো । কিন্তু শিল্পী মানুষ , ব্যবসা চলেনি । এক অটো চালকের বোনকে বিয়েও করে কিন্তু পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । তখনই সিনেমা জগতে যায় !

তনুজার মোবাইল থেকে কল পেয়ে বলে :: দিদিভাই , তোমাকে ভুলবো কী করে ? তোমার বাবা , কত্তাবাবু আমাদের ভগবান ! আজ আমি যা হয়েছি, ওনার জন্যেই ! একদিন দেখা করো , জাগরিও খুশি হবে !

মনে পড়ে, তনুজা অনেক সময় অটো করে কোথাও গেলে -অটোচালক ভাড়া নিতে অস্বীকার করতো । বলতো :: দিদি , আপনার থেকে ভাড়া নিতে পারবো না । এটা মিন্টুবাবুর অটো । আপনাদের নীলকুঠিতে-ই থাকে ।

এখনকার নীলকুঠি ভিন্ন । এটা, এক সমাজ সেবকের দান করতে চাওয়া ; ঐতিহাসিক মহল। এখানে পাইন কাঠের গন্ধ আছে , আছে মধুর রৌদ্রছায়ার খেলা ।

এর জন্যই দেশে এসেছে তনুজা । একে স্পর্শ করবে এবার আর অন্য গল্প শুনবে বলে ।

তাহলে, নীলকুঠি কয় প্রকার ???

যথা সময় পৌঁছে গেলো সেই বৃদ্ধের দুয়ারে । সারপ্রাইজ ভিজিট ওর । তাই কেউ জানতো না । এই লোকালয়ে লোকটির কথা সবাই জানে । ওকে সবাই চেনে ।

কিন্তু তনুজার মনে হল যে ওর সততা নিয়ে লোকের মনে সংশয় আছে । বিশেষ করে একটি অভিশপ্ত বাড়িকে, গরীবের মহল করার আইডিয়াও নাকি ভয়ঙ্কর । ওদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, ওদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বিপদের মুখে । সরকারও যেই বাড়িকে কব্জা করতে পারেনি, সেইরকম একটি প্রেতালয়কে দান হিসেবে দেওয়া-- কিছু দু:স্থ, দূর্বলকে কোনো শুভ চিন্তা হতেই পারেনা । লোকটি গাদা গাদা রান্না করে

আর ভিডিও বানায় । তারপর কী করে যে অনেক টাকা পায়, নানান দেশ থেকে কে জানে! এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে বেশ । রান্নাগুলো, অল্প সংখ্যক কিছু পরিচিত মানুষকেই দেওয়া হয় । আর টাকাই তো সব নয়! ওর নাকি ইয়া ইয়া ক্রেডিট কার্ড হয়েছে । আদতে যতটা গর্জে, ততটা বর্ষে না । প্রবাদের মতনই । টিভি চ্যানেল নাকি ওর ওপরে অনুষ্ঠান করে গেছে । কিন্তু পুরোটাই যে ফাঁকি সেটা জানেনা । জানতে চায়ওনি ।

লোকাল লোকের সাথে কথা না বলে ; নিজেদের সাজানো কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়ে চলে গেছে । ওরা বিষয় ও ব্যাক্তি চায় । সততার দায়িত্ব নাকি ওদের নয় । ওরা খবরের নামে গল্প খোঁজে ।

আর সেটা পেলেই হল । যাতে ওদের চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা বাড়বে ; ওরা তাই করতেই ব্যস্ত ।

তনুজা লোকটির সাথে দেখাও করে । কেন এই ছলনা ? কেন ? কিসের জন্য ? এই বয়সে ? এইভাবে যোগাড় করা টাকা তো পাপের ধন । দুনম্বরী সম্পত্তি । তা তো বেশিদিন রাখা যাবে না সবাই জানে । তাহলে কেন

এই ভড়ং ? নাটক ? জাল ভিডিও ??? মোটিভ ছাড়া ক্রাইম তো সাইকোরা করে । অসুখের কামড়ে !

তনুজা স্থির করে যে সত্য জানবে । কেন এক বৃদ্ধ এইভাবে লোক ঠকাবে ? তার জীবন তো খরচের খাতায় !! অন্য কারো মুখের কথায় ভরসা না করে সে একদিন ওর সাথে সোজাসুজি দেখা করতেই গেলো ; অনেক প্রশ্ন নিয়ে । কেন এই ছলনা ? কেন ?

কিসের জন্য ? কী আর আশা করে এই দীপ নিভে যাবার সময় ? যদিও বরিস বলে যে সবকিছুর কেন খোঁজার দরকার নেই । তাতে নিজের বিপদ বাড়ে আর অশান্তি । জগতে সবকিছুর কেন থাকলেও তা জানার অধিকার সবার থাকেনা । অনেক সময় কারণ বাদ দিয়ে ফল নিয়েই আনন্দ পেতে হয় । নাহলে ভয়ঙ্কর সত্য সামনে আসতে পারে যা সহ্য করা মুশ্‌কিল ।

++++++++++++++

লোকটির ধাম তো ফুলগড় আর নাম ফুলেল লিং ।

ফুলেল লিং এক চা বাগানের, শ্রমিক নেতার ছেলে ছিলো । তার বাবা মালিকের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে । কারণ সে সত্যি সত্যি শ্রমিকের ভালো আর কোম্পানির ভালো একসাথে চাইতো ।

গাট্টাগোট্টা চেহারার ফুলেন্দুর ; ছেলে- ছিলো ফুলেল লিং । ফুলেন্দুর একটা বদ্‌গুণ ছিলো । অসম্ভব মদ খেতো আর সন্ধ্যের পরে ওকে নেশায় ঢলে যেতে যেতে, খাটিয়াতে শুয়ে পড়তে দেখা যেতো । ফুলেন্দুর জন্যই চা বাগানের মরা ব্যবসায় জোয়ার আসে । সবাই যখন এলাকার বাগান ; মাল্টি ন্যাশেনালকে বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় সেই সময় ফুলেন্দুর জন্য ফুলেলের জন্মস্থান, লেবুবাড়ি চা বাগান ফুল ফেঁপে ওঠে । আগে ওখানে লেবারদের দিয়ে কাজ করিয়ে মাইনে দিতোনা ম্যানেজার । মালিক জানতো না । দরিদ্র শ্রমিকেরা অভুক্ত থাকতো । শিশুরা রুগ্ন । তাদের মায়েদের অ্যানিমিয়া ইত্যাদি হতো । অপুষ্টি থেকে নানান ব্যাধি আর মৃত্যু । শ্রমিকের জন্য যেই টাকা মালিক দিতো ; তার মোটা অংশ হাতাতো ম্যানেজার ও তার তাঁবেদারি করা লোকেরা । ফুলেন্দু সেই ব্যবস্থা তুলে দেয় । মালিক নতুন প্রথা শুরু করে । লেবারেরা হাতে আর ক্যাশ টাকা পেতোনা । বদলে ওদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হতো আর টাকা সেখানে যেতো । ওদের সেইসব অ্যাকাউন্ট খোলার পরে, পরিচালনা করাও শেখানো হতো । দুপুরে ; বাগানে লাঞ্চ দেবার প্রথা শুরু করে ফুলেন্দু । সেখানে চিপ্‌ সব মিল পাওয়া যেতো যা স্বাস্থ্যকর । শ্রমিকদের

জন্য হাসপাতাল আর প্রাথমিক স্কুলও খোলে মালিক। সবই ফুলেন্দুর তৎপরতায়। তাই তার নামও হয়।

পরে অবশ্য চা বাগানটাকে বিক্রি করে দেয় মালিক। মোটা দামে। তারপর মালিক চলে যায় বিদেশে।

ততদিনে ফুলেন্দু মারা গেছে অতিরিক্ত মদ্যপানে। আসলে ফুলেলের মা ছিলোনা। প্রবল রক্তশুন্যতায় মারা যায় অতি কম বয়সে। ফুলেন্দুর মনে হত যে লাজবন্তীকে মানে ফুলেলের মাকে সে বাঁচাতে পারলো না। যে কোনো কারণেই হোক্ !

তাই মনের দুঃখে অতিরিক্ত নেশা করা ধরে ফুলেন্দু।

চিকিৎসকের বারণ শোনেনা। সাবধান বাণীও মনে রাখেনা।

--আর মদ খেলে এবার লিভার ফেটে মরবে তুমি !

ফুলেন্দু বলতো , আমার বেটা ফুলেল এখন বড় হইচে। সব সামলাইতে পারে।এখন আমি না রইলেও, ওর মাঈয়ের কাছে চলি গেলেও কিছু হবে না বোটে।

ফুলেন্দু মারা যেতেই মালিক , লেবুবাড়ি বেচে দেয়। একজন এফিশিয়েন্ট কর্মী হারানোর চেয়েও কাছের মানুষ হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে পাড়ি দেয় প্রবাসে।

সেখানে গিয়ে একটি জাহাজ মানে মাঝারি মানের জাহাজ কেনে । সেই জাহাজ ভাড়া দেওয়া হতো নানান মানুষকে । বিয়েশাদি হতো , খ্রীস্টমাস , জন্মদিন পালনের জন্য লোকেরা ঐ জাহাজ ভাড়া নিতো ।

বিদেশ যাবার আগে, ফুলেন্দুর বেটা ফুলেলকে সাথে নিয়ে যায় মালিক । কোথায় যাবে কিশোরটি ? ওর তো কেউ নেই । মা নেই, বাবা নেই । হয়ত শেষে কোনো কুপথে পা দেবে ! তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই মালিক দেশ ছাড়ে ।ফুলেন্দু ছিলো মালিকের আপন ভাই-এর মত ।

লেখাপড়া শেখে ফুলেল ; বিদেশে । কোনো চাকরির জায়গায়, মালিক সেফ্‌টি অনুসারে কাজ করছে কিনা , শ্রমিকদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা এইসব দেখার জন্য সংস্থা আছে । সেই সংস্থায় কাজ নেয় ফুলেল লিং ; safety specialist----হিসেবে । ভালো আয় হতো । কাকাবাবু অর্থাৎ চা বাগান মালিকের ওপরে আর নির্ভরশীল নয় সে ! নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, চা বাগানের কুলির ছেলে ! বিদেশে । সাক্ষাৎ সাদাদের রাজ্যে । মনে খুব আনন্দ হতো নিজের সাফল্যে । শুধু মা ও বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতো !

ওরা ভার্চুয়ালি আছে , মনের মণিকোঠায় । কিন্তু রিয়েলিটিতে আর নেই । খুব কষ্ট হতো । কিন্তু এত দু:খের মাঝেও আনন্দ ছিলো মালিকের মেয়ে, লাবণীর

প্রেমে পড়েছিলো বলে আর তাকে সবসময় দেখতেও পেতো । মনের কথাও যে খুলে বলতো । প্রিয় বান্ধবী আর কি ! কিন্তু লাবণী ওকে নিজের বন্ধুই মনে করতো । লাভার নয় । বলতো, **ভালোবাসার অনেক রং হয় । কে বললো আমি তোকে ভালোবাসিনা ?**

শুধু আমার ভালোবাসার রং হলুদ কিংবা কমলা ।

আমি তোকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি- কিন্তু লালগোলাপের মতন নয় , হলুদ কিংবা কমলা গোলাপের মতন । তুই আমার হৃদয়ের কাছাকাছি আছিস্ই ;স্বজন ও বন্ধু হয়ে । কিন্তু তোকে আমি বিয়ে করতে পারবো না ।

লাবণী, ভালো মেয়ে ও স্পষ্ট-বক্তা । নিজের কার্য সিদ্ধির জন্য, ছেলেদের ব্যবহার করেনা । অপরূপা নাহলেও তার মধ্যে যে মিষ্টত্ব টুকু ছিলো ; তাকেই সাত পাকে ধরতে ইচ্ছুক ছিলো ফুলেল । কিন্তু লাবণী ওকে ভিন্ন চোখে দেখে । ফুলেলের কাজে মন বসেনা । শুকিয়ে যেতে শুরু করলো । চিকিৎসক ওর ব্যামো ধরতে পারলো না । ওকে মানসিক ভাবে উৎফুল্ল হতে বললো । বললো :: সমস্ত অসুখের মূলে আছে তোমার অবসাদ গ্রস্ত মন । বিষাদ থেকে বার না হতে পারলে, দেহেও বল আসবে না ।

এমন সময় রক্ষা কর্ত্রী রূপে দেখা দিলো লাবণী ।

প্রিয় বন্ধু শুকিয়ে যাচ্ছে । আধমরা হয়ে আছে ! আর কেন, সেটা ভালো মেয়ে লাবণী জানে । তাই স্থির হল যে লাবণীর মতন অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করে, গৃহী হবে ফুলেল । অর্থাৎ ফুলেলের বিয়ে দেওয়া হবে । ওকে জীবিত রাখতে হলে এর দরকার । লাবণীর মতন দেখতে কোনো মেয়েকে পাত্রী করা হবে ।

টাকাপয়সা থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায় । খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হল । লাবণীর একটা রঙিন ছবি ছাপা হল আর বলা হল যে এরকম দেখতে মেয়েরা যোগাযোগ করুক, পাত্র এরকম দেখতে মেয়েকেই বিয়ে করবে ।

সহজে পাওয়া গেলোনা । অনেক মেয়েই এলো তবে বেশির ভাগের চোখ লাবণীর সাথে মিলছে , কারো নাক, কারো চুল কিন্তু হুবুহু এক কেউ নেই ।

শেষকালে ওরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে- ঠিক তখনই জাপান থেকে এক ভারতীয় মেয়ের বাবা, যোগাযোগ করে। **ওরা জাতিতে মারাঠি । মেয়ের নাম প্রমিলা ফুলে । একদম লাবণীর জেরক্স কপি ; প্রমিলা ফুলে !**

ফুলেলের গলায় মালা দিয়ে ; পরবাসে চলে আসতে ইচ্ছুক সে । প্রমিলা ফুলের স্বামী হবে- ফুলেল লিং । আজব মিল বৈ কি ! প্রমিলার বাবার ; চা-বাগানের নাম ছিলো **ফুলবাড়ি টি-এস্টেট** । সেখানে ম্যানেজারি করতো প্রমিলার বাপ্ । পরে জাপানে, চায়ের কাজে যায় আর এক জাপানী রমণীকে বিবাহ করে । সেখানেই প্রমিলা জন্মায় । কিন্তু মেয়ের বিয়ে ; নিজের দেশের লোকের সাথে দেবার ইচ্ছে জানায় ম্যানেজার সাহেব !! **তাই ফুলেল লিং এর সাথে সম্বন্ধ আসে ।**

প্রমিলা লেখাপড়ায় খুব ভালো। মেধাবী । আর ওর বাবা গজেন্দ্র বাবু- নিজের মেয়ের সমস্ত মার্কশিট ছেপে ; বিয়ের কার্ডে লাগিয়ে দেয় । যাতে প্রত্যেকে দেখতে পারে যে মেয়ে কত মেধাবী । যশস্বিনী হতে সক্ষম ।

বিয়ের কার্ডের সাইজ ; মোটা বইয়ের মতন । তার পাতাই প্রায় গোটা ত্রিশেক । সমস্ত পরীক্ষার মার্কশিট আছে সেখানে । একেবারে ছাপার অক্ষরে ।

শুরু হল ফুলেল লিং এর বিবাহিত জীবন ।

+++++++++++++++++++

আজ আকাশ ভেঙে শিল পড়েছে। তনুজা , ফুলেলকে ওদের বাসার কথা বললো । শিল পড়লে, ওরা কী কী করতো সেসব । ফুলেল লিং বলে :: তাহলে চলুন আজকে আমরা খিচুড়ি , ইলিশ মাছ ভাজা আর লঙ্কার আচার দিয়ে মিনি বনভোজন করি !

তনুজার সামনে, ফুলগড়ের বিরাট সবুজ মাঠ ! নারকেল আর খেজুড় গাছের ছায়ায় ঢাকা পথ-- আর জলার ধারে অসংখ্য পাখির কলতান । শিল পড়েছে তাই পাখিরা অবশ্য --জমাট বাঁধা নীরের কারণে, নীড়ে ফিরে গেছে।

টপাটপ্ শিল পড়েছিলো তো আকাশ থেকে ! মূহুর্তের মধ্যে সমস্ত মাঠ হয়ে ওঠে সাদা , মনে হয় যেন কেউ আইসক্রিম ছড়িয়ে দিয়েছে !!!

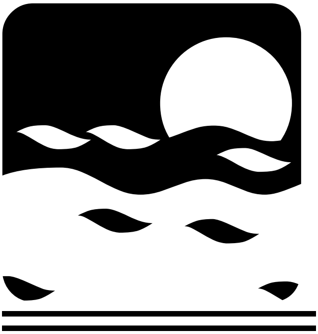

ফুলেলের ; বদ-গুণের মধ্যে ছিলো বিড়ির নেশা । চা বাগান থেকেই সে বিড়ি ফুঁকতো । বিদেশেও বিড়ি আনাতো । ভারতীয় দোকান থেকে । পান আর বিড়ি । জর্দা দেওয়া পান , এন্তার বিড়ি এইসব ।

দাঁতগুলো তাই ঈষৎ লালচে । মুখে বিড়ির গন্ধ ।

বিয়ের পরে ; ওদের বাগানের মালিক মানে লাবণীর বাবা, ওদেরকে একটি জাহাজ ভাড়া করে দেয় । ক্রুজ করার জন্য । মাঝারি সাইজের জাহাজ । কিন্তু ডেকে শুয়ে ; সান-বাথ নেওয়া চলে । **বেশ কেতাদস্তুর ওর**

সাজসজ্জা । লাল রং এর ভেসেল আর তাতে সোনালী দিয়ে আঁকা । পাল তোলা জাহাজ । পালের রং ; ধবধবে সাদা । সেই জাহাজে অবশ্য আগে লাবণী ক্রুজ করেছে । আসলে ওটা ওদের পারিবারিক জাহাজ ।

বিনোদন তরী । সেখানে লাবণী যখন টপলেস্ হয়ে শুয়ে ছিলো ; তখন খুব লোভ হচ্ছিলো ফুলেলের । কিন্তু উপায় নেই । এ শুধু তার বান্ধবী । লক্ষণ-রেখার বাইরে যাওয়া চলবে না । বিপদের আশঙ্কা আছে । দূর হতে তোমারে দেখেছি আর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি ; গানের মতন ।

লাবণীকে দেখে মনে মনে যত ছবিই আঁকা হোক্ না কেন, সেই ছবির ক্যানভাস কিন্তু হতো প্রমিলা ।

কারণ সে-ই এখন ফুলেলের লাবণী !!!

লাবণীর সন্ধান করে দেওয়া ; আরেক লাবণী ।

++++++++++++++++++++

ফুলেলের কপাল মন্দ ; তাই প্রমিলা বেশিদিন বাঁচেনি ।একটি মুসলিম দেশে ওরা বেড়াতে যায় । অসাধারণ আর্কিটেকচার দেখে ফেরার সময়, বোমার আঘাতে প্রমিলা মারা যায় । আসলে এই দেশটির সাথে তাদের প্রতিবেশী আরেক দেশের-- সবসময় যুদ্ধ লেগেই থাকতো । সবসময় টেনশান আর বোমাবাজি !

রোজই লোক মরছে , শিশুরা মরছে । স্কুলে যেতে গিয়ে ; বাচ্চা মারা যাচ্ছে বোমার আঘাতে । গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ মানুষ কেউ-ই এই বোমার আঘাত থেকে

বাঁচতে পারে না । সেখানেই, একটি রুগ্ন কিশোরকে বাঁচাতে গিয়ে প্রমিলা মারা যায় । যেখানে বোম ব্লাস্ট হয়, সেখানে আদৌ প্রমিলা ছিলো না । ও বেরিয়ে এসেছিলো তার আগেই কিন্তু একটি কান্নাভেজা গলা শুনে, ঘুরে দেখে এক কিশোর-- যার হাতে লাঠি আর তাতে ভর দিয়ে সে হাঁটে। সেই ছেলেটি কীভাবে যেন আটকে গেছে বিল্ডিং ও দেওয়াল এর মধ্যে । ওকে বাঁচাতে ভেতরে ঢুকে যায় প্রমিলা আর তখনই বোমাটি ফেটে যায় ।

এরপর শুরু হয় ফুলেলের জীবনের অন্য অধ্যায় ।

আর বিয়ে শাদি করার দিকে যায়না । বুঝতেই পারে এসব ওর জন্য নয় ।

এরপরে সে চাকরি করতে করতেই, একদিন বীচে মানে সমুদ্র স্নানে যায় । বিরাট, নীল সমুদ্র । সোনালী বালি চারদিকে । কত মানুষ রোদ পোহাচ্ছে সেখানে । কিছু বাচ্চারাও আছে ।

সেখানেই জলে নামার পরে, একটু আলো কমে আসে । সূর্য ডুবে যাবার সময় হয় । একটি পাড়ের কাছে চলে আসা হাঙর এসে রক্তাক্ত করতে যায় ফুলেল লিং -কে ! ভয় না পেয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে সে লড়াই করে ।

<u>হাঙরে আর মানুষে সে কি লড়াই !!!!</u>

অনেক মানুষ ভয়ে ডাঙায় উঠে গেছে , অনেকে দূর থেকে চিৎকার করছে । এমন অবস্থায় জয় হয় ফুলেলের । হাঙর পরাজিত ও কুপোকাৎ হয়ে, নেতিয়ে পড়ে । পাড়ে এসে আটকে যায় ।

ফুলেল ক্লান্ত হলেও, এইভেবে আনন্দ পায় যে একটি হাঙরকে সে কাহিল করেছে । অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিয়েছে । বীরত্বের জন্য মনে মনে একটু গর্বও হয় !!

নিউজ হেডলাইন কী হবে ?

<u>ভারতীয় যুবকের হাতে নিহত ভয়াল হাঙর, শার্ক !!!</u>

মনে মনে নানান কিছু কল্পনা করে চলে ফুলেল লিং !! সিং নেই তবু নাম তার সিংহ --- বীর নয় তবু হাঙর মেরেছে ফুলেল লিং---গো !!!!

পরেরদিন সমস্ত নিউজ মিডিয়া ওকে কন্টাক্ট করে । টিভি, কাগজ সব । অনেক সাক্ষাৎকার দেয় সে। কিন্তু সেখানেও ওকে ধাওয়া করে নকল সত্ত্বা !!!

<u>নকল লাবণীর মতন এবার নকল হাঙর !!!</u>

এই হাঙরটি আদতে একটি রোবট । মেরিন রোবট । একে জলে ছেড়েছে, সরকারের ফিশারিজ্ দপ্তর ।

আর ইনি কেবল একজন নন ; এমন আরো বেশ কিছু হাঙর আছে, জলে । তারা নানান ভাবে মানুষের উপকার করে । যা আসল হাঙর করে না কিন্তু করতে সক্ষম, তার জলচর হওয়া আর দৈহিক বলের কারণে ।

ভেঙে পড়ে ফুলেল । আবার নকল এর খপ্পড়ে পড়েছে তার সত্ত্বা !!! তবুও এসব নিয়ে আর মাথা ঘামায় না ।

বনভোজন শেষ । এতদূর গল্প বলে, চা খাওয়ানোর আহ্বান জানায় তনুজাকে । তনুজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় । গ্রামীণ কায়দায় রান্না করা, বেগুনের বড়া দেয় ওকে । গোটা বেগুনটাকে তেল মাখিয়ে রেখে দেয় । ওটা কড়াইতে ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করে । তারপর নামিয়ে, খোসা ফেলে দিয়ে ওকে ব্যসন , লঙ্কা , নুন এইসব দিয়ে মেখে বড়া বানায় । ধনেপাতার চাটনি দিয়ে খেতে দেয় । মন্দ লাগেনা তনুজার কিন্তু ও গল্পটা শুনতে বেশি আগ্রহী । এই বড়ার ভিডিও নাকি অনেক লাইক পেয়েছে । লোকে পন্থা শিখে নিয়েছে !

সেদিন আর বেশি কথা হয়না । ভেজা ভেজা আবহাওয়া, তাই শেষ অবধি ও হোটেলে ফিরে যায় ।

স্নান করে ফ্রেস লাগে । রাতে চৌকিদার একটা বড় লন্ঠণ নিয়ে এসে, সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ! এই অঞ্চলে নাকি বিজলী থাকলেও বেশিরভাগ সময় আলো জ্বলে না । তাই কেরোসিন দিয়ে আলো জ্বালানো হয় । গন্ডগ্রাম যাকে বলে !!

তনুজার বাড়ি , নীলকুঠিও একসময় মফ:স্বল এলাকায় ছিলো আর গ্রামের মতন ধানক্ষেত, পুকুর সব ছিলো সেখানে । কিন্তু আলোর সমস্যা ছিলো না ।

ওর অন্যান্য আত্মীয়রা- দূর থেকে যারা আসতো , তারা বলতো যে কলকাতা ও তার আশেপাশে-কে আলোর মধ্যে ভাসাতে গিয়ে, দূরের গ্রামগঞ্জে আর আলো জ্বলে না !! এত বিদ্যুৎ দিতে পারেনা সরকার ! তাই ওরা আঁধারের মধ্যে ডুবে থাকে । এগুলো আগে শুনলেও, তনুজা জানতো না যে অন্ধকারে দিনের পর দিন থাকলে কেমন লাগে । আজ বুঝলো ।

যখন সব ফুরাতে চলেছে ; তখনই নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে ! হয়ত এতদিন খেয়াল করার অবকাশ ছিলো না অথবা এরকমই জগতের নিয়ম । সবার ক্ষেত্রেই !

মনে মনে সে ভাবে যে কাল ফুলেলের কাছে না গিয়ে, ওকে এই সরাইখানায় ডেকে আনলে কেমন হয় ?

সে তো বিদেশে ছিলো ; একেবারে গেঁয়ো না কাজেই বিদেশের অনেক কিছুতেই অভ্যস্ত আছে । ওকে ডিনারে ডেকে নিয়ে এখানে খাওয়াবে । বলবে ::: তুমি সবাইকে রেঁধে খাওয়াও । আজ আমি তোমায় খাওয়াবো !!!

হয়ত রাজি হবেনা তবুও প্রস্তাব দিয়ে দেখা যাক্ !

যথারীতি ওকে মোবাইলে ফোন করে তনুজা , আমন্ত্রণ জানায় । ওকে অবাক করে দিয়ে ফুলেল বলে ::: আমি কিন্তু নিরামিষ খাবো ।

এত খাসির অন্ত্র, মূর্গীর ঠ্যাং , হাঁসের কোর্মা , চিতল মাছের পেটি আর ইলিশের ভাঁপে রান্না করা পাচক নিজে খাবে নিরামিষ ?? আজব ঘটনা । তবে তার অনুরোধ তো রাখতেই হবে কাজেই তনুজা বলে -ঠিক আছে আমিও নাহয় নিরামিষই খাবো ।

ঢ্যাঁড়স ভাজা , বেগুনি, ঝিঙে পোস্ত , ফুলকফির ডালনা , পাঁপড়ের ডালনা , পটলের কোর্মা ইত্যাদি দিয়ে ভোজন পর্ব শেষ হয় । বাইরে গাঢ় আঁধার । জর্দা দেওয়া পান খেলো ফুলেল সিং নয় -লিং ।

তনুজা সিগারেট পান করতো । ওর পাল্লায় পড়ে এই কদিনে বিড়িও ফুঁকেছে । দেশী সিগার আর কি !

চলে যায় । মন্দ নয় । কাজেই পানও খেলো জর্দা দিয়েই । তারপর সোফার ওপরে পা মুড়ে বসে গল্প শুনতে শুরু করলো ।

<u>গলা ঝেড়ে বলে ওঠে ফুলেল---</u>

আমি তখন বিদেশেই । একটি কম্পিটিশানে ভাগ নিয়েছি । একা থাকি । সেফ্‌টি স্পেশালিস্টের কাজ করি । উইক-এন্ডে যাই ট্রেকিং করতে অথবা টেনিস খেলতে । কখনওবা বীচেও যেতাম ! অনেক মেয়েই কাছে ঘেঁষতে আসে- কিন্তু আমি কাঠি গলাতে দিইনা । আমার আর ওসবে মন লাগতো না । মনে হতো আমি বুড়ো হয়ে গেছি । ওসবের বয়স আমার নেই । যাইহোক নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম । এমন সময়

একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। সেখানে বলা হয় যে যেই লোক প্রথম হবে সে যাবে সুইজারল্যান্ড, সাতদিনের জন্য। যে দ্বিতীয় হবে সেও সুইজারল্যান্ডেই যাবে তবে ঠিক চারদিনের জন্য আর তৃতীয় হবে যে সে যাবে মোট দু দিনের জন্য। সন্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে অন্যরা পাবে একটি করে সোনার চেন।

কম্পিটিশানটি ছিলো রেসের। প্রথমতঃ যেই ঘোড়াতে আমি বাজি ধরি তাকে আগের দিন রাতে, বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হয়। কে করে আজও তা রহস্য। সেই ঘোড়াটার প্রথম হবার সম্ভাবনা ছিলো। দূর্দান্ত ঘোড়া ছিলো সে। কিন্তু আর দৌড়ালো না- বরং ওর লাশ ভেসে ওঠে মাঠের, বিশাল টিভি স্ক্রিনে।

এরপরে ভেঙে পড়লেও আমি অন্য ঘোড়াকে নিই। ফলে সে দ্বিতীয় হয়। কারণ অন্যরা তেমন তুখোড় নয়। আর একেবারে লোকচক্ষুর বাইরে থাকা এক ঘোড়া প্রথম হয়। তৃতীয় যে হয়, সেও রেসের আগে মিনি রেসে ;পিছিয়ে ছিলো। তাতে সমস্যা হয়নি কিন্তু পরে দেখা গেলো যে প্রথম বিজয়ী , সুইজারল্যান্ড যাবার টিকিট পেলেও অন্যরা পেলোনা। তারা থাইল্যান্ডে মানে ব্যাংককে যাবার টিকিট পেলো। সবই হবে তবে কথামতন সুইজারল্যান্ডে নয়, ঐ ব্যাংককে। কোথায়

ভূস্বর্গ, সাহেবদের দেশ --সুইজারল্যান্ড আর কোথায় এশিয়ানদের দেশ থাইল্যান্ড !!!

আমি তর্ক না করলেও, অন্যরা আপত্তি জানালে কর্তৃপক্ষ বলে যে একটি ঘোড়ার মৃত্যু হয়েছে তাই ভ্রমণের কথা না ভেবে, সবার শোক পালন করা উচিৎ । । **কে কী ভাবলো, তার চেয়েও বড় কথা হল আমার যেন মনে হল ,এটা হল আরেক নকল জিনিস দিয়ে আমাকে ভোলানোর খেলা ।**

এই খেলা যে শুরু হয়েছে আমার জীবনে ; তা কোনোদিন শেষ হবেনা ? আমার সাথে কোনো ভালো জিনিস কেন হয়না ? আমি তো কারো ক্ষতি করিনি , কারো জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি, এমন কি আমি হেরে গিয়ে সেই ফিল্ড থেকেই সরে গেছি । তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে । আমি কাউকে বলতে যাইনি যে হাঙর যান্ত্রিক হলেও, তার শক্তি কিছু কম ছিলো না বা সে মায়াবী হলেও, কম হিংস্র ছিলোনা । আমি জীবনকে এও বলিনি যে লাবণীকে যদি না দিলে তবে প্রমিলাকে কেন কেড়ে নিলে ? আমি তো প্রমিলাকে পেয়ে কোনো অভিযোগ জানাইনি- তোমার কাছে ! আমার খুব দু:খ হয়েছিলো লাবণীকে না পেয়ে কিন্তু প্রমিলাকে পেয়েও আমি খুশি ছিলাম । কিন্তু তাও আমার ফুটো কপালে সইলো না । লাবণীর বর, নীল

আর্মস্ট্রং এর দুই আর্ম সত্যি স্ট্রং ছিলো ।তাই সে দুই হাতে, অত্যাধুনিক হেভি হেভি- মোটর বাইক তুলতে পারতো । আমি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে আমি তো অত শক্তিমান নই, কাজেই আমি ঐভাবে মোটর বাইক তুলতে পারবো না । তাই ভালোই তো হয়েছে, লাবণীর বিয়ে ওর সাথে হয়ে !! ও হল এমন একজন লোক যে বিশেষ ক্ষমতাধারী , আমার মতন গ্রস আর উইক -পুরুষ মানুষ নয় । তবুও ঈর্ষা করিনি ।

বাবা ও মা তো কবেই চলে গেছে । আমার কোনো সন্তানও নেই ! **কেন বারবার আমার সাথেই প্রতাড়না করছে এই কুহক জীবন ? কেন ? কী করেছিলাম আমি ? কর্মা ফর্মা আমি মানিনা ।**

তাই স্থির করি যে আমি প্রতিশোধ নেবো । বিশ্বাস করুন এমন প্রতিশোধ স্পৃহা আমার মধ্যে জেগে ওঠে যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না । আমি কোনোদিনই এতটা হিংস্র বা রাফ্ নই । আমি এমনিতে খুব কোমল মনের মানুষ আর সততাকে গুরুত্ব দিই । আমার বাবা আমাকে বলে গিয়েছিলো -- মিথ্যে কথা বলবে না । মিথ্যাচারিতা , অসৎ কাজ আর হিংসা মানুষের মনকে বিষিয়ে দেয় । আস্তে আস্তে সে নিচে নামতে থাকে আর একদিন তার পরিবার পরিজন ধ্বংস হয়ে যায় । কোনো পরিস্থিতি যদি এমন হয় যেখানে তোমার সত্যি

বলাতে অনেকের সর্বনাশ হবে, সেখানে চুপ করে থাকবে কিন্তু মিথ্যে বলোনা । তাই বাবার আদেশ মেনে চলতাম । কিন্তু কী লাভ হল তাতে ? জীবন আমাকে ঠকিয়ে নিলো । তাই ঠিক করি, আমি বদলা নেবো ।

বিদেশে এক অ্যাফ্রিকান পাদ্রীকে দেখেছি । খুব ভালো করেই চিনতাম তাঁকে । সেই ভদ্রলোকের নাম ছিলো --যোশিমিটি বাবাডিলো । উনি বয়সে প্রায় প্রৌঢ় বলা যায় । ষাটের কাছাকাছি হবেন । এক সময় আমার পড়শী ছিলেন । ভদ্রলোক, অ্যাফ্রিকার কোনো এক রাজবংশের মানুষ । সবকিছু ত্যাগ করে, অন্য দেশে চলে আসেন পাদ্রী হবেন বলে ।ওঁর পরিবার খুশী না হলেও ; বাধা দেয়নি ।

ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ ও সৎ ছিলেন । আদর্শই তাঁর জীবন ছিলো । পরের উপকার করা , অন্যদের সাহায্য করা , গরীবের ভালো করা এই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত । ওঁর গীর্জার পাশে বাস করতো এক মানুষ, যে শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছিলো । খুবই দরিদ্র মানুষ । মিশনারিদের সাথে আসে, পরবাসে ।তার নাম গ্রাহাম । গ্রিম- বলে, লোকে ওকে ডাকতো । পাউরুটি বেক্ করতো আগে । সেই লোকটিকে বিয়ে করে এক শ্রীলঙ্কারই মেয়ে । পেশায় নার্স । মিশনারি সংস্থার নার্স । তার কাজ ছিলো , দু:স্থ রুগীর কাছে গিয়ে

গিয়ে- সেবা করা । মেয়েটির নাম ছিলো রজনী । গ্রাহাম সারাদিন কাজ করতো, আর রাতে মৃত-গৃহপালিত পশুর দেহকে মমির আকার দিতো । তাদের মিনি-কফিন বানাতো । ওদের মালিকেরা ; তাদের প্রিয় পশুকে- চিরতরে কাছে রাখতে ইচ্ছুক তাই এই ব্যবস্থা করা হতো । ওদিকে বৌ রজনী, যেতো সেবিকার কাজে । ওদের এক ছেলে হয় , জেসন । কিন্তু জেসনকে খুব ছোটবেলায় মানে তার জন্মের পর পরই ওর হাসপাতাল থেকে, চুরি করে নিয়ে যায় কেউ । ওকে আর পাওয়া যায়না । শিশু চুরি হলে যেমন খোঁজ খবর করা হয় - সেরকম হলেও ওর সন্ধান মেলেনা । মুষড়ে পরে গ্রাহাম ও রজনী ।

দুজনে কাজে ডুবে গিয়ে, শোক ভোলার চেষ্টা করে । রজনীকে অনেকে আবার মা হতে বললে সে বলে যে ---হলেওবা ; এক সন্তানের জায়গা অন্য কেউ নিতে পারেনা । এবার যে আসবে সে নতুন এক সত্ত্বা হয়েই বাবা ও মায়ের কোলে আসবে ।

মা হবার চেষ্টা হলেও,ভাগ্যের খেলায় কিছুদিন পরে গ্রাহামের মৃত্যু হয় । এক কঠিন অসুখে । হয়ত শোক পেয়ে এমন দূর্বল হয়ে পড়ে যে চট্ করে বড় অসুখে ধরে ফেলে । খেতো না সারাদিন । কেবল স্মোক করতো আর মদ্যপানে নিজেকে ব্যস্ত রাখতো । বলতো

:: আমি মমি বানাই । তবুও নিজের বাচ্চাটাকে, মমি করেও, কফিনে শোয়াতে পারলাম না । হয়ত বেওয়ারিশ লাশের ঘরে পড়ে আছে !!!

গ্রাহাম মারা যেতেই, রজনী কাজ-কম্মো ছেড়ে দিয়ে পাগলিনীর মতন ঘুরে বেড়াতো । গীর্জা ওকে খেতে দিতো । আর রাতে ও, গ্রাহামের কবরের পাশে ফুলের ঝাড় নিয়ে গান গাইতো । বড় মায়ায় ভরা ওর গলা আর দরদ দিয়ে গাইতো । যোশিমিটি বাবাডিলো ; রোজ ওর গান শুনতেন । উনিই ওকে খাবার দিতেন ।

সেই একবেলাই রজনীর খাওয়া হতো ! করুণ সুরে গান গাইতো সে । আমিও শুনেছি সে গান । হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়, সেই গান শুনলে । দিনের পর দিন সেই গান শুনে একদিন ফাদার ওকে নিয়ে পালিয়ে যান । শোনা যায় অন্যত্র গিয়ে ঘর বাঁধেন । যোশিমিটি বাবাডিলোর বক্তব্য ছিলো যে মেয়েটা এইভাবে একা একা বাঁচবে কী করে ? জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা যায়না । যাইহোক্ না কেন, জীবনের মোকাবিলা করতে হয় । আত্মহত্যা করা বোকামি ও পাপ । কিন্তু এত শক্তি সঞ্চয় করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে , সবাই পারেনা । যদি কারো হাতটা ধরলে, একটু উঠে দাঁড়াতে সুবিধে হয় তাহলে সেই হাতটা বাড়িয়ে দেওয়াও একটা কর্তব্য বলে মনে করেন ফাদার ! তাই ওকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধেন

। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমাজ-- এইসব যুক্তি বোঝেনা । ওরা ফাদারকে লম্পট ও চরিত্রহীন , জঘন্য পাপী, সুযোগসন্ধানী হায়না -- বলে চিহ্নিত করে ফেলে ।

+++++++++++++

আমি ভেবে দেখলাম যে ফাদার যখন নিজে আরাধনার পথভ্রষ্ট হয়েছেন আর তাতে তার কোনো মানসিক সমস্যা হয়নি তখন আমিও এমন করতে পারি । ফাদার তো নিজেকে বাঁচাতে যুক্তি খাড়া করবেনই ! আসলে তো ওঁর মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ জেগে ওঠে । আর হবেনাই বা কেন ? তাকে দেখতে একদম সোনাক্ষী সিন্‌হার মতন ! কালোপণা ফাদারের বুকে ঢেউ তোলে বৃদ্ধ বয়সে ,রূপবতী রজনী । এতো জলের মতনই পরিষ্কার । নাহলে যিশু যদি এমন বিধান দিতেন তাহলে পাত্রও জুটিয়ে দিতেন । তাই আমি বুঝলাম যে আমি এমনটা করলে ততটা ক্ষতি হবে না । ফাদারের এই কম্মোর পরেও যখন ধরিত্রী ফেটে যায়নি ।আমি এবার জীবনকে ঠকাবো । হয়ত তাতে আমি কিছু সুবিধে পাবো । আমার ভালো হবে । মনের মতন সব হবে ।আর দেখুন হচ্ছেও তো সেরকম ! কত ডলার , পাউন্ড আসছে ! আমি এখন রীতিমতন ধনী । জানেন তো বিখ্যাত কথাটি ? “We should forgive

our enemies, but not before they are hanged" (– **Heinrich Heine**)

আর এইসব ডোনেশানের একটি কড়িও আমি কাউকে দিইনা আর দেবোও না কোনোদিন । লোকে যদি সন্দেহ না করে, দুই হাতে আমাকে ঢেলে দেয়-- তার জন্য আমি কী করতে পারি ? ডিজিট্যাল ক্যামেরার এদিকে বসে তো আর আমি, আমার সততার প্যারামিটার খতিয়ে দেখার ব্যাপারগুলো ; লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারিনা ! যারা তবুও দিচ্ছে এটা তাদের দায়িত্ব , সবকিছু চেক্ করে অর্থ দান করা । কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সব দেখে নেওয়া । আমার মনে হয়না আমি কোনো অন্যায় করছি । আর আমি উদার হস্তে দান না করলেও, অনেক মানুষকেই তো খাওয়াই । কিছু পুণ্য তো হচ্ছেই ! আর নীলকুঠির মতন বাড়ি বা সুবিশাল এক মহল ; আমি দু:স্থদের বাসের জন্য তৈরী করার প্ল্যান করেছি আর সেই কাজে হাতও দিয়েছি । সেটাও তো একটা বড় ব্যাপার । কৈ এতদিন তো কেউ এই মহলকে নিয়ে এমন কিছু ভাবেনি ? আর অভিশপ্ত-ফপ্ত, এসব আমি মানিনা । রকেট সায়েন্স আর প্লুটো ভ্রমণের যুগে এসব অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয় ! প্রেতের দিকে কেউ নিউক্লিয়ার বম্ব তাক্ করে দেখেছে কী হয় ? বন্দুক ফন্দুক দিয়ে কিছু হয়না আর । ওরাও ইভলব্ করছে ।

ওরা আমাদের মাইন্ডের প্রজেকশন্ । আমরা যেমন ইভলব্ করছি ,সেরকম প্রেতেরাও করছে- আমাদের মন বিমানে চড়ে । আর ওল্ড উক্তি ও যুক্তি , **চোখের বদলে চোখ নিলে একদিন সবাই অন্ধ হয়ে যাবে**--- এইসব পুঁথির বুলি । আজকাল চোখের বদলে চোখ না নিয়ে যদি প্রতিপক্ষকে ফুলের মালা দেওয়া হয় ; তাহলেও সে এসে সবার আগে চোখগুলো খুবলে নেবে । কাজেই যেই যুগে যেমন আচার বিচার ; সেরকমই আমি করছি । বরং বলুন আমি এখন চালাক আর অত্যাধুনিক সমাজ এর উপযুক্ত হয়ে গেছি । তাই আমাকে আর কেউ সহজে ঠকাতে পারবে না । এমনকি স্বয়ং জীবনও নয় । নিজের কন্ট্রোলের বাইরে থাকা জীবন নামক রহস্যময় এই এপিসোড ; এখন আমার অঙ্গুলি হেলনে চলবে । আমিই ওর নির্মাতা ও পরিচালক । কাজেই ও এখন আর আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না । আমিই ওর স্ক্রীন আবার আমিই সেই কাগজ-- যার ওপরে ওর সংলাপগুলো লেখা হচ্ছে ।।। আমি জয়ী হতে পেরেছি! জানেন তো সেই বিখ্যাত উক্তি ? If your father is a poor man,it is your fate but if your father-in-law is a poor man, it's your stupidity--!!!

The End